৬ষ্ঠ পারা

لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً (١٤٨)

(১৪৮) মন্দ কথা প্রকাশ করাকে আল্লাহ পছন্দ করেন না; তবে যার উপর যুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র।[১] আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً (١٤٩)

(১৪৯) যদি তোমরা সৎকাজ প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে কর অথবা অপরাধ ক্ষমা কর,[২] তাহলে নিশ্চয় আল্লাহও পরম ক্ষমাশীল, মহা শক্তিমান।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً (١٥٠)

(১৫০) নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণকে অবিশ্বাস করে আর আল্লাহ ও রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি' এবং তারা এর মধ্যবর্তী এক পথ অবলম্বন করতে চায়।

أُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً(١٥١)

(১৫১) তারাই হল প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাসী।[৩] আর আমি অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُوْلَئِكَ

(১৫২) পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলগণে বিশ্বাস করে এবং তাদের কোন একজনের সাথে অন্য জনের পার্থক্য করে না, তাদেরকেই তিনি পুরস্কার দেবেন।[৪] আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল,

---

(১) কারো মধ্যে যদি কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তার প্রকাশ্যে সমালোচনা না করার প্রতি শরীয়তে খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, বরং তাকে নির্জনে বুঝাতে বলা হয়েছে। কিন্তু যদি ধর্মীয় কোন কল্যাণ থাকে, তাহলে প্রকাশ্যে সমালোচনা করায় কোন অসুবিধা নেই। এমনিভাবেই জনসমক্ষে প্রকাশ্যে কোন কুকর্ম করা নিতান্ত অপছন্দনীয়। একে তো কুকর্মে লিপ্ত হওয়াটাই নিষিদ্ধ, যদিও তা পর্দার অন্তরালে হয়, তার উপর সেটা জনসমক্ষে প্রকাশ্যে করা অতিরিক্ত আর একটি অপরাধ। আর তার জন্য ঐ কুকর্মের অপরাধ দ্বিগুণ হতে পারে। উক্ত দুই ধরনের অপরাধের কথা এই আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। আর তাতে এটাও বলা হয়েছে যে, কারো কৃত বা অকৃত অপরাধের কারণে তাকে প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করো না। অবশ্য যালেমের যুলুমের কথা জনসমক্ষে বর্ণনা করার ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। যালেমের যুলুমের কথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করার মাঝে কয়েকটি মঙ্গল নিহিত আছে। যেমন, সম্ভবতঃ সে যুলুম করা থেকে বিরত হতে পারে অথবা সে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করবে। দ্বিতীয়তঃ লোকে তার ব্যাপারে সাবধান ও সতর্ক থাকবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন লোক রসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়।' রসূল ﷺ তাকে বললেন, "তুমি তোমার ঘরের জিনিসপত্র বের করে রাস্তার উপর রেখে দাও।" লোকটি তাই করল। তারপর যেই রাস্তা দিয়ে পার হয়ে যায়, সেই তার কারণ জিজ্ঞাসা করে। আর সে প্রতিবেশীর অত্যাচারের কথা বলতেই প্রত্যেকেই তাকে অভিশাপ করে। প্রতিবেশী এই পরিস্থিতি দেখে নিজের ভুল স্বীকার করল এবং 'ভবিষ্যতে আর কোনদিন কষ্ট দেবে না' বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। আর প্রতিবেশীকে নিজ জিনিসপত্রগুলিকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। *(আবু দাউদ, আদব অধ্যায়)*

(২) কোন ব্যক্তি যদি কারো উপর যুলুম বা অন্যায়-উৎপীড়ন করে, তাহলে শরীয়তে মযলুম ব্যক্তির জন্য ততটুকু পরিমাণে প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি আছে, যতটুকু পরিমাণ যুলুম তার প্রতি করা হয়েছে। নবী ﷺ বলেন, "আপোসের মধ্যে গালিগালাজ করে এমন দুই ব্যক্তি যা কিছু বলে পাপ সূচনাকারী ব্যক্তির উপরই বর্তায়; যদি না অত্যাচারিত ব্যক্তি (অর্থাৎ যাকে প্রথমে গালি দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিশোধে সেও গালি দিয়েছে সে) সীমালংঘন করে।" (মুসলিম ৪৫৮৭নং) কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতির সাথে সাথে ক্ষমা প্রদর্শন করার প্রতি অধিক অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গরূপে ক্ষমতাবান, তা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা ক'রে দেন। এই জন্য তিনি বলেন, {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} অর্থাৎ, মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। কিন্তু যে ক্ষমা ক'রে দেয় ও আপোস-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। (সূরা শূরা ৪০) আর হাদীসে মহানবী ﷺ বলেছেন, "অপরাধ মার্জনা করার কারণে, আল্লাহ (মার্জনাকারীর) সম্মান ও ইজ্জত বাড়িয়ে দেন।" (মুসলিম)

(৩) আহলে কিতাবদের সম্পর্কে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা কিছু নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আর কিছু নবীগণকে অমান্য করে। যেমন, ইয়াহুদীরা ঈসা ﷺ ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি এবং খ্রিষ্টানরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, নবীগণের মধ্যে পার্থক্যকারীগণ (ঈমানদার নয়); বরং পুরোপুরি কাফের।

(৪) এই আয়াতে ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা সকল নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। যেমনটি মুসলিমরা কোন নবীকে অমান্য করে না। কুরআন কারীমের উপরোক্ত স্পষ্ট ঘোষণায় ঐ সব বিভ্রান্ত লোকদের মতবাদ খণ্ডন

سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً(١٥٢)

পরম দয়ালু।

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُبِيناً (١٥٣)

(১৫৩) গ্রন্থধারিগণ তোমাকে তাদের জন্য আকাশ থেকে কোন কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) অবতীর্ণ করতে বলে,[৫] কিন্তু তারা মূসার কাছে এর থেকেও বড় দাবী করেছিল; তারা বলেছিল, 'প্রকাশ্যে আমাদেরকে আল্লাহ দেখাও।' তাদের সীমালংঘনের জন্য তারা বজ্রাহত হয়েছিল। অতঃপর স্পষ্ট প্রমাণ তাদের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, এটাও আমি ক্ষমা করেছিলাম। এবং মূসাকে প্রদান করেছিলাম সুস্পষ্ট প্রমাণ (ও প্রভাব)।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً (١٥٤)

(১৫৪) আর তাদের অঙ্গীকার নেবার সময় তূর পর্বতকে তাদের উপর উচ্চ ক'রে ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, 'নতশিরে (নগরের) দ্বার প্রবেশ কর' এবং তাদেরকে বলেছিলাম, 'শনিবারে (বিশ্রামের দিন মাছ ধরে) সীমালংঘন করো না' এবং তাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (١٥٥)

(১৫৫) (তারা অভিশপ্ত হয়েছিল) কারণ, তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল, আল্লাহর আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করেছিল, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল[৬] এবং বলেছিল, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত।' বরং তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহই তাদের (হৃদয়ে) মোহর মেরে দিয়েছেন, ফলে তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে।

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيماً (١٥٦)

(১৫৬) এবং তারা তাদের অবিশ্বাসের জন্য ও মারয়্যামের প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করার জন্য (অভিশপ্ত হয়েছিল)।[৭]

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ

(১৫৭) আর 'আমরা আল্লাহর রসূল মারয়্যাম-পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি' তাদের এ উক্তির জন্য (অভিশপ্ত হয়েছিল)। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং ক্রুসবিদ্ধও করেনি,[৮] বরং তাদের জন্য (অন্য একজনকে ঈসার) আকৃতি দান করা হয়েছিল।[৯]

করা হয়েছে, যারা বলে, 'সব ধর্ম সমান।' যারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেদের ধর্মমত ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিজাতির পদমূলে 'উৎসর্গ' দিতে চায়। যারা কুরআনের স্পষ্ট বিধানকে উপেক্ষা করে অন্যান্য ধর্মানুসারীদেরকে বুঝাতে চায় যে, ইসলামই একমাত্র মুক্তির সনদ নয়, বরং অমুসলিমরাও তাদের নিজ নিজ ধর্মে-কর্মে স্থির থেকে পরকালে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে! অথচ কুরআনের এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী। সুতরাং কেউ যদি শেষ রসূলের রিসালতকে অমান্য করে, তাহলে আল্লাহর উপর তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। (আরো দেখুন সূরা বাক্বারার ৬২নং আয়াতের টীকা)

(৫) অর্থাৎ, যেমন মূসা তূর পাহাড়ে গিয়ে ফলকের উপর লিখিত তাওরাত নিয়ে এসেছিল, তেমনি তুমিও আসমানে গিয়ে লিখিত কুরআন নিয়ে এস। তাদের এ দাবী নিছক শত্রুতা, হঠকারিতা ও হঠধর্মিতার উপর ভিত্তি ক'রে ছিল।

(৬) প্রকৃত বাক্য এই রকম হবে; (فَبِنَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُم) অর্থাৎ আমি তাদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ, আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার ও অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করার কারণে অভিশপ্ত করেছিলাম বা শাস্তি দিয়েছিলাম।

(৭) এই আয়াতের লক্ষার্থ হল, ইউসুফ নাজ্জার (যোসেফ) নামক একজন লোকের সঙ্গে মারয়্যাম (আঃ)এর ব্যভিচারের যে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল তার খণ্ডন। আজও কিছু তথাকথিত তত্ত্বানুসন্ধানী এই মস্তবড় মিথ্যা অপবাদকে একটি 'প্রামাণ্য সত্য' বলে বিশ্বাস করে এবং ইউসুফ নাজ্জারকে ঈসা ﷺ-এর পিতা প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে। (نعوذ بالله) এমনকি তারা ঈসা ﷺ-এর অলৌকিক জন্মকেও অস্বীকার করে।

(৮) এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহুদীরা ঈসা ﷺ-কে হত্যা করতে বা শূলে চড়াতে (ক্রুসবিদ্ধ করতে) কোনটিতেই সফল হয়নি যেমনটি তাঁদের উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও অভিপ্রায় ছিল। এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সূরা আলে-ইমরানের ৫৫নং আয়াতের টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে।

(৯) এর ব্যাখ্যা হলো, যখন ঈসা ﷺ ইয়াহুদীদের হত্যা করার চক্রান্তের কথা জানতে পারলেন, তখন তাঁর ভক্ত ও সহচরবৃন্দকে এক স্থানে সমবেত করলেন, যাদের সংখ্যা ১২ অথবা ১৭ ছিল। এবং তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার স্থানে নিহত হতে প্রস্তুত আছ? যাকে আল্লাহ তাআলা আমার মত আকার-আকৃতি দান করবেন। তাঁদের মধ্যে একজন যুবক প্রস্তুত হয়ে গেলেন। সুতরাং ঈসা ﷺ-কে আল্লাহর নির্দেশে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হল। এরপর ইয়াহুদীরা এসে ঐ যুবককে নিয়ে গেল এবং ক্রুসবিদ্ধ করল, যাঁকে মহান আল্লাহ ঈসা ﷺ-এর মত আকৃতি দান করেছিলেন। আর ইয়াহুদীদের

اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً (١٥٧)

নিঃসন্দেহে যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, বস্তুতঃ তারা এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল এবং অনুমানের অনুসরণ ছাড়া এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না।[১০] আর এ নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।

بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (١٥٨)

(১৫৮) বরং আল্লাহ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন[১১] এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১২]

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ

(১৫৯) ঐশীগ্রন্থধারীদের প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে (ঈসাকে) বিশ্বাস করবেই[১৩] এবং কিয়ামতের দিন সে (ঈসা)

ধারণা হল যে, তারা ঈসাকেই ক্রুসবিদ্ধ করতে কৃতকার্য ও সক্ষম হয়েছে। অথচ তিনি ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না; বরং তাঁকে জীবিত অবস্থায় সশরীরে নিরাপদে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। (ফাতহুল ক্বাদীর, ইবনে কাসীর)

(১০) ঈসা ﷺ-এর মত আকৃতিবিশিষ্ট লোকটিকে হত্যা করার পর ইয়াহুদীদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়; একদল বলে, ঈসাকে হত্যা করা হয়েছে। অন্য একদল বলে, ক্রুসবিদ্ধ ব্যক্তি ঈসা নয়; বরং অন্য কোন ব্যক্তি। এরা ঈসা ﷺ-কে হত্যা ও ক্রুসবিদ্ধ করার কথা অস্বীকার করে। আবার অন্য একদল বলে, তারা ঈসা ﷺ-কে আসমানে চড়তে স্বচক্ষে দেখেছে। কিছু মুফাস্সির বলেন, উক্ত মতভেদ থেকে উদ্দেশ্য হল, স্বয়ং নাসারাদের নাস্তুরিয়া নামক একটি ফির্কা বলে যে, ঈসা ﷺ-কে তাঁর মানবিক দেহ হিসাবে ক্রুসবিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু ঈশ্বর হিসাবে নয়। আবার মালকানিয়া নামক একটি ফির্কা বলে, মানবিক ও ঐশ্বরিক উভয়ভাবেই তাঁকে হত্যা ও ক্রুসবিদ্ধ করা হয়েছে। (ফাতহুল ক্বাদীর) যাই হোক তারা মতবিরোধ, সংশয় ও সন্দেহের শিকার।

(১১) এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা নিজের অলৌকিক শক্তি দ্বারা ঈসা ﷺ-কে জীবিত অবস্থায় সশরীরে আসমানে তুলে নিয়েছেন। বহুধা সূত্রে বর্ণিত হাদীসেও এ কথা প্রমাণিত আছে। এ সকল হাদীস হাদীসের সমস্ত গ্রন্থ ছাড়াও বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। সে সব হাদীসে ঈসা ﷺ-কে আসমানে তুলে নেওয়া ছাড়াও পুনরায় প্রলয় দিবসের প্রাক্কালে পৃথিবীতে তাঁর অবতরণ এবং আরো বহু কথা তাঁর ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) এই সমস্ত হাদীসগুলিকে বর্ণনা করার পর শেষে লিখেছেন যে, উল্লিখিত হাদীসগুলি রসূল ﷺ হতে বহুধা সূত্রে প্রমাণিত। এই হাদীসগুলির বর্ণনাকারীগণ হলেন ঃ আবু হুরাইরাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উসমান বিন আবুল আ'স, আবু উমামা, নাওয়াস বিন সামআন, আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আ'স, মুজাম্মে' বিন জারিয়াহ, আবূ সারীহাহ এবং হুযাইফা বিন উসায়েদ ﷺ প্রমুখ সাহাবাবৃন্দ। এই সমস্ত হাদীসে তিনি কোথায় ও কিভাবে অবতরণ করবেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি দিমাশকের মিনারা শারক্বিয়াতে ফজরের নামাজের ইকামতের সময় অবতরণ করবেন। তিনি শূকর হত্যা করবেন, ক্রুস ভেঙ্গে ফেলবেন ও জিযিয়া কর বাতিল ক'রে দিবেন। তাঁর শাসনামলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মুসলমান হয়ে যাবে। তিনিই দাজ্জালকে হত্যা করবেন, তাঁর যুগেই ইয়া'জুজ ও মা'জুজ ও তাদের ফিতনা-ফাসাদের প্রকাশ ঘটবে এবং তাঁর বদ্দুআতে তারা বিনাশ ও ধ্বংস হয়ে যাবে।

(১২) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মহাপরাক্রমশালী ও বিজয়ী, তাঁর ইচ্ছাকে কেউ রদ্দ করতে পারে না। যে তাঁর আশ্রয়ে চলে আসবে, তার বিরুদ্ধে যে যতই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করুক না কেন, তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি হচ্ছেন মহাপ্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রতিটি কাজের ভিতরে হিকমত, যুক্তি ও নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান রয়েছে।

(১৩) আলোচ্য আয়াতে (قبل موته) এর মধ্যে هُ (তার) সর্বনামটি থেকে কিছু মুফাস্সিরগণের মতে খ্রিষ্টানকে বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক খ্রিষ্টানই নিজ অন্তিম মুহূর্তে ঈসা ﷺ-এর নবুঅতের সত্যতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু সেই মুহূর্তের ঈমান তাদের আদৌ কোন উপকারে আসবে না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা যা সালাফ ও বহু মুফাস্সির কর্তৃক সমর্থিত, তা হলো موته (তার মৃত্যু) শব্দের সর্বনামে ঈসা ﷺ-এর মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, যখন তিনি দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করার পর, ইসলামের প্রচার ও প্রসার কাজে মগ্ন হবেন এবং ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করবেন, সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম হবে। অবশিষ্ট আহলে কিতাবরা ঈসা ﷺ-এর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর প্রতি যথাযথ ঈমান আনবে। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, "যাঁর হাতে আমার জীবন আছে সেই সত্তার কসম! অবশ্যই এমন এক দিন আসবে, যেদিন তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনে মারয়্যাম একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে অবতরণ করবেন, ক্রুস ভেঙ্গে চুরমার করবেন, শূকর নিধন করবেন, জিযিয়া কর বাতিল করবেন, মাল-সম্পদ এত বেশী হবে যে, (দান বা সাদকা) গ্রহণ করার মত লোক থাকবে না। সেই সময় একটি সিজদাহ্ দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার থেকেও উত্তম হবে।" (অর্থাৎ, কিয়ামত নিকটে জানার কারণে ইবাদত মানুষের কাছে অতি প্রিয় হবে।) এ হাদীস বর্ণনার পর আবু হুরাইরাহ ﷺ বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে, কুরআন কারীমের এ আয়াত পাঠ করতে পার, (وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) অর্থাৎ, আহলে কিতাবদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। (বুখারী ঃ কিতাবুল আম্বিয়া) এই হাদীস এত অধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তার ফলে তা 'মুতাওয়াতির' হাদীসের পর্যায়ভুক্ত। আর এই 'মুতাওয়াতির' শুদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতেই আহলে সুন্নাহর সর্বসম্মত আক্বীদাহ মতে ঈসা ﷺ আসমানে জীবিত আছেন এবং কিয়ামতের প্রাক্কালে তিনি দুনিয়াতে আসবেন, দাজ্জালকে হত্যা করবেন, সমস্ত ধর্মের অবসান ঘটাবেন, সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করবেন। ইয়া'জুজ ও মা'জুজ তাঁর সময়েই প্রকাশ হবে এবং তাঁর বদ্দুআর কারণে ইয়া'জুজ ও মা'জুজের ফিতনার অবসান

তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।[১৪]

الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً (١٥٩)

(১৬০) বহু পবিত্র জিনিস যা ইহুদীদের জন্য বৈধ ছিল, তা আমি তাদের জন্য অবৈধ করেছি তাদের সীমালংঘনের জন্য এবং আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেবার জন্য।[১৫]

فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً (١٦٠)

(১৬১) এবং তাদের সূদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য। আর তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত ক'রে রেখেছি।

وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً (١٦١)

(১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানপক্ক[১৬] তারা ও বিশ্বাসিগণ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করে এবং যারা নামায যথাযথভাবে পড়ে,[১৭] যাকাত প্রদান করে[১৮] এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে,[১৯] অচিরে তাদেরকেই আমি মহা পুরস্কার দান করব।

لَكِنْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً (١٦٢)

(১৬৩) নিশ্চয় আমি তোমার নিকট অহী প্রেরণ করেছি, যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মানের নিকট আমি অহী প্রেরণ করেছিলাম[২০] এবং দাউদকে যবূর দান করেছিলাম।

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً (١٦٣)

(১৬৪) নিশ্চয় আমি অনেক রসূলের কথা পূর্বে তোমার নিকট বর্ণনা করেছি[২১] এবং অনেক রসূলের কথা তোমার নিকট বর্ণনা

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ

ঘটবে।

(১৪) এই সাক্ষ্য তাঁর প্রথম জীবন সম্পর্কিত হবে, যেমন আল্লাহ্ সূরা মায়েদায় উল্লেখ করেছেন, {وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ} অর্থাৎ, যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী। (আয়াত ১১৭)

(১৫) অর্থাৎ তাদের অপরাধ ও অপকর্মের কারণে শাস্তি স্বরূপ বহু বৈধ জিনিসকে অবৈধ ক'রে দিয়েছি। (বিস্তারিত বিবরণ সূরা আনআম ১৪৬ আয়াতে আছে।)

(১৬) এ থেকে উদ্দেশ্য, আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﷺ ও অন্যান্য সাহাবাবৃন্দ যাঁরা স্বধর্ম বা (ইয়াহুদী ধর্ম) ত্যাগ ক'রে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

(১৭) এ থেকেও উদ্দেশ্য সেই ঈমানদারগণ, আহলে কিতাবগণের মধ্যে যাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন। অথবা মুহাজির ও আনসারগণকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যাঁরা পূর্ণ ইসলামী জ্ঞান ও পূর্ণ ঈমানের অধিকারী তাঁরা ঐ সকল পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে, যেগুলিকে আল্লাহ অপছন্দ করেন।

(১৮) এ থেকে উদ্দেশ্য, মালের যাকাত বা পবিত্রতা অথবা আত্মার পবিত্রতা, অর্থাৎ চরিত্র ও কর্মের পবিত্রতা। কিংবা মাল ও আত্মা উভয়ের যাকাত বা পবিত্রতা উদ্দেশ্য।

(১৯) অর্থাৎ, যাঁরা এই কথার উপর দৃঢ়-প্রত্যয় রাখে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন ও কৃতকর্মের পুরস্কার ও শাস্তি আছে।

(২০) ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু মানুষ মনে করে যে, মূসা ﷺ-এর পর আল্লাহ আর কোন মানুষের উপর অহী বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেননি, এমনকি তারা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অহী বা প্রত্যাদেশকেও অস্বীকার করে। তারই প্রেক্ষাপটে মহান আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ ক'রে ওদের ধারণার খন্ডন করেছেন এবং রসূল ﷺ-এর রিসালাত ও অহীকে প্রমাণ করেছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

(২১) যে সকল নবী ও রসূলগণের নাম ও তাঁদের ঘটনাবলী কুরআন কারীমে বর্ণিত হয়েছে, তাঁদের সংখ্যা ২৪ অথবা ২৫ যথা ঃ (১) আদম ﷺ (২) ইদরীস ﷺ (৩) নূহ ﷺ (৪) হূদ ﷺ (৫) সালেহ ﷺ (৬) ইব্রাহীম ﷺ (৭) লূত ﷺ (৮) ইসমাঈল ﷺ (৯) ইসহাক্ব ﷺ (১০) ইয়াকূব ﷺ (১১) ইউসুফ ﷺ (১২) আইউব ﷺ (১৩) শুআইব ﷺ (১৪) মূসা ﷺ (১৫) হারূন ﷺ (১৬) ইউনুস ﷺ (১৭) দাউদ ﷺ (১৮) সুলাইমান ﷺ (১৯) ইল্‌য়্যাস ﷺ (২০) আল-য়্যাসা' ﷺ (২১) যাকারিয়া ﷺ (২২) ইয়াহইয়া ﷺ (২৩) ঈসা ﷺ (২৪) যুল কিফ্‌ল ﷺ (অধিকাংশ মুফাসসিরগণের নিকটে) (২৫) মুহাম্মাদ ﷺ।

نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيماً (١٦٤)

করিনি।[২২] আর মূসার সাথে আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছেন।[২৩]

رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (١٦٥)

(১৬৫) আমি সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী[২৪] রসূল প্রেরণ করেছি; যাতে রসূল (আসার) পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে।[২৫] আর আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً (١٦٦)

(১৬৬) কিন্তু আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তিনি স্বয়ং তার সাক্ষী। তিনি তা নিজ জ্ঞান অনুসারে অবতীর্ণ করেছেন। এবং ফিরিশ্তাগণও তার সাক্ষী। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً (١٦٧)

(১৬৭) নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে ও আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে, তারা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً (١٦٨)

(১৬৮) নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে ও অত্যাচার করেছে, আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না এবং কোন পথও দেখাবেন না;[২৬]

إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (١٦٩)

(১৬৯) জাহান্নামের পথ ছাড়া। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আর এ তো আল্লাহর পক্ষে সহজ।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لله مَا فِي السَّمَوَاتِ

(১৭০) হে মানব! রসূল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য এনেছে, সুতরাং তোমরা বিশ্বাস কর, তোমাদের কল্যাণ হবে। আর তোমরা অবিশ্বাস করলেও আকাশ ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সব আল্লাহরই[২৭] এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

---

(২২) যে সকল নবী ও রসূলগণের নাম ও ঘটনাবলী কুরআনে উল্লেখ হয়নি তাঁদের সংখ্যা কত? এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। তবে একটি হাদীস পাওয়া যায় যেটা আম জনতার নিকট খুবই প্রসিদ্ধ, তাতে নবী ও রসূলগণের সংখ্যা এক লাখ চব্বিশ হাজার এবং অন্য এক হাদীসে আট হাজার উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু এই হাদীসগুলি অত্যন্ত দুর্বল। অথচ কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে শুধু এতটুকু বুঝা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবেলায় যুগে যুগে মহান আল্লাহ নবী ও রসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছেন। অতঃপর নবুঅতের সেই ধারাবাহিকতা শেষ হয় মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে। কিন্তু শেষনবী ﷺ-এর পূর্বে নবী ও রসূলের সংখ্যা কত? এর সঠিক উত্তর আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। পক্ষান্তরে শেষনবী ﷺ-এর পরে যত নবুঅতের দাবী করেছে বা করবে, তারা সকলেই দাজ্জাল ও মিথ্যুক। আর তাদের মিথ্যা নবুঅতের অনুসারীগণ ইসলামের গন্ডি হতে খারিজ। যারা উম্মতে মুহাম্মাদিয়া হতে পৃথক এক প্রতিদ্বন্দ্বী উম্মত। যেমন, বাবিয়াহ, বাহাইয়াহ, মীর্যাইয়াহ বা ক্বাদিয়ানী ফির্কা প্রভৃতি। অনুরূপভাবে মির্যা ক্বাদিয়ানীকে প্রতিশ্রুত 'মাসীহ' বলে বিশ্বাসী লাহোরী মির্যায়ী ফির্কাও।

(২৩) (অদৃশ্য থেকে গায়বীভাবে অথবা স্পষ্টভাবে।) এটি মূসা ﷺ-এর পৃথক বৈশিষ্ট্য; যার ফলে তিনি অন্যান্য নবীদের তুলনায় পৃথক মর্যাদার অধিকারী। সহীহ ইবনে হিব্বানের এক বর্ণনার ভিত্তিতে ইমাম ইবনে কাসীর আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথনে আদম ﷺ ও মুহাম্মাদ ﷺ-কেও মূসা ﷺ-এর শরীক বলেছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর সূরা বাক্বারার ২৫৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৪) বিশ্বাসী বান্দাদেরকে জান্নাত ও জান্নাতের সুখ-সম্পদের সুসংবাদবাহী এবং অবিশ্বাসী বা কাফেরদেরকে আল্লাহর আযাব এবং জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুন থেকে ভীতি-প্রদর্শন ও সতর্ককারী।

(২৫) অর্থাৎ, নবুঅত অথবা সুসংবাদ দান ও ভীতি প্রদর্শনের ধারাকে এই জন্যেই অব্যাহত রেখেছেন, যাতে শেষ বিচারের দিনে কেউ এ ওজর পেশ করতে না পারে যে, আমাদের নিকট তোমার কোন বার্তা পৌঁছেনি। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, {وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى} অর্থাৎ, যদি আমি ওদেরকে তার পূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তাহলে ওরা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বেই তোমার নিদর্শন মেনে নিতাম। (সূরা ত্বা-হা ১৩৪ আয়াত)

(২৬) কেননা, অব্যাহতভাবে কুফরী ও যুলুমে লিপ্ত থাকার কারণে তারা তাদের অন্তরগুলিকে কালো ক'রে নিয়েছে। যার কারণে হিদায়াতের আলো বা ক্ষমা, কোনটিই তাদের জন্য আশা করা যায় না।

(২৭) অর্থাৎ তোমাদের কুফরী করার কারণে আল্লাহর কোন ক্ষতি হবে না। যেমন মূসা ﷺ তাঁর স্বজাতিকে বলেছিলেন, {إِن

وَالأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (١٧٠)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلَـهٌ وَاحِدٌ

(১৭১) হে গ্রন্থধারিগণ! তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না[২৮] এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া (মিথ্যা) বলো না। মারয়্যাম-তনয় ঈসা মসীহ তো আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী; যা তিনি মারয়্যামের মাঝে প্রক্ষেপ করেছিলেন ও তাঁরই তরফ হতে সমাগত আত্মা।[২৯] সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস কর এবং বলো না যে, '(আল্লাহ) তিনজন।'[৩০] তোমরা নিবৃত্ত

{تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ} অর্থাৎ, তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ কাফের হয়ে যাও; তবুও নিঃসন্দেহে আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং সর্বপ্রশংসিত। (সূরা ইব্রাহীম ৮) আর হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ বলেন; হে আমার বান্দা সকল! তোমাদের আদি ও অন্ত সমস্ত মানুষ ও জ্বিন যদি একটি এমন মানুষের অন্তরের মত হয়ে যায়, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু, তাহলে তাতে আমার সাম্রাজ্যে কোন বৃদ্ধি লাভ হবে না। আর তোমাদের আদি ও অন্ত সমস্ত মানুষ ও জ্বিন যদি একটি এমন মানুষের অন্তরের মত হয়ে যায়, যে তোমাদের মধ্যে সব থেকে বড় অবাধ্য, তাহলে তাতে আমার সাম্রাজ্যে কোন হ্রাস বা ঘাটতি হবে না। হে আমার বান্দা সকল! তোমরা সকলেই যদি একটি ময়দানে একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে আমার নিকট চাও এবং প্রত্যেক মানুষকে যদি তার কামনা মোতাবেক দান করি, তাহলে তা আমার ভাণ্ডার ঐ পরিমাণ হ্রাস পাবে, একটি সূচ সাগরে ডুবানোর পর তার ডগায় লেগে যে পরিমাণ সাগরের পানি হ্রাস পায়। (সহীহ মুসলিম ঃ বির্র অধ্যায়)

(২৮) غُلُوْ (অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি) শব্দের তাৎপর্য হল, কোন বস্তুকে তার নির্ধারিত সীমা থেকে বাড়িয়ে দেওয়া। যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা ﷺ ও তাঁর মা মারয়্যাম (আঃ)কে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে করতে তাঁদেরকে রিসালাত ও বান্দার স্থান থেকে উপরে তুলে আল্লাহর আসনে বসিয়ে দিয়েছে এবং যথারীতি তাঁদের ইবাদত করছে। ঠিক এমনিভাবেই ঈসা ﷺ-এর শিষ্য ও সহচরদের ব্যাপারেও তারা অতিরঞ্জিত করেছে, তাঁদেরকে নিষ্পাপ বলেছে এবং কোন জিনিসকে হারাম ও হালাল করার ব্যাপারে পূর্ণ এখতিয়ার প্রদান করেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ} অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে তাদের পণ্ডিত-পুরোহিতগণকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তাওবাহ ৩১) আল্লাহর আসনে বসানোর সারকথা হচ্ছে, তাদের (পুরোহিতগণ কর্তৃক) হালালকৃত জিনিসকে হালাল এবং হারামকৃত জিনিসকে হারাম বলে মেনে নেওয়া। অথচ এ বিষয়ে পরিপূর্ণ অধিকার একমাত্র আল্লাহর। কিন্তু আহলে কিতাবরা এই অধিকারও তাদের পণ্ডিত-পুরোহিতগণকে প্রদান করেছে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদেরকে ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপ মহানবী ﷺও খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় ব্যাপারে অতিরঞ্জন করা দেখে স্বীয় উম্মতকে এহেন ভয়াবহ মহামারীর কবল হতে রক্ষা করার জন্য পূর্ণ সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এমন অতিরঞ্জন করবে না, যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা বিন মারয়্যামের ব্যাপারে করেছে। যেহেতু আমি আল্লাহর বান্দাই, সেহেতু তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল বল। (বুখারী ঃ আম্বিয়া অধ্যায়, আহমাদ ১/২৩, ১/১৫৩) কিন্তু বড় পরিতাপ ও দুঃখের বিষয় এই যে, (সতর্কবাণী থাকতেও) উম্মতে মুহাম্মাদীর দাবীদারগণও এই মহামারীর কবল থেকে রেহাই পেল না; যাতে খ্রিষ্টানরা আক্রান্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ উম্মত তার নবীর ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন ক'রে ক্ষান্ত হয়নি; বরং নেক বান্দাদেরকেও আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করেছে; যা আসলে খ্রিষ্টানদেরই আচরণ ছিল। অনুরূপভাবে উলামা ও ফুক্বাহাগণ, যাঁরা দ্বীনের ব্যাখ্যাতা ও ভাষ্যকার ছিলেন, তাঁদেরকে শরীয়ত রচনার অধিকার প্রদান করেছে। (فإنا لله وإنا إليه راجعون) মহানবী ﷺ সত্যই বলেছেন, "যেমন একটি জুতার অপর জুতার সাথে অবিকল মিল থাকে, অনুরূপ তোমরাও পূর্ববর্তী উম্মতের অবিকল অনুকরণ ও অনুসরণ করবে।" অর্থাৎ প্রত্যেক কাজে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

(২৯) كلمة الله (আল্লাহর বাণী বা শব্দ)এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, كن (হও) শব্দ। যার দ্বারা আল্লাহর নির্দেশে বিনা পিতায় ঈসা ﷺ জন্মলাভ করেন। মহান আল্লাহ এ শব্দটি জিবরীল ﷺ-এর মাধ্যমে মারয়্যাম (আঃ)এর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। روح الله এর অর্থ হচ্ছে, সেই 'ফুঁক' যা আল্লাহর নির্দেশে জিবরীল ﷺ মারয়্যাম (আঃ)এর কামীসের গলার নিকট খোলা অংশে ফুঁকেছিলেন, যেটাকে মহান আল্লাহ তাঁর অসীম শক্তিতে পিতার বীর্যের বিকল্প উপাদানে পরিণত করেন। সুতরাং ঈসা ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর কালেমা (বাণী); যা ফিরিশ্তা দ্বারা মারয়্যাম (আঃ)এর নিকট পৌঁছে দেন এবং তিনি তাঁর 'রূহ' বা ফুঁকও; যা জিবরীল ﷺ মারফৎ মারয়্যাম (আঃ)এর নিকট পৌঁছে দেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

(৩০)খ্রিষ্টানরা বিভিন্ন ফির্কায় বিভক্ত ছিল। কোন ফির্কা ঈসা ﷺ-কে স্বয়ং আল্লাহ বলে বিশ্বাস করে, কোন ফির্কা তাঁকে আল্লাহর অংশীদার মনে করে, আবার কোন ফির্কা তাঁকে আল্লাহর পুত্র মনে করে। তারপর যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী, তারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। তাদের মতে পিতা, পুত্র ও মারয়্যাম তিনজনই ঈশ্বর। তারা ঈসা ﷺ-কে তিনের এক ঈশ্বর মনে ক'রে থাকে। সুতরাং মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা 'আল্লাহ তিনজন' বলা হতে বিরত হও। কারণ আল্লাহ হচ্ছেন একক, অদ্বিতীয়, (যাঁর কোন শরীক নেই)।"

سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً (١٧١)

হও, তোমাদের মঙ্গল হবে। আল্লাহই তো একমাত্র উপাস্য, তাঁর সন্তান হবে --এ হতে তিনি পবিত্র। আকাশ ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সব তাঁরই। আর কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لله وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً (١٧٢)

(১৭২) মসীহ আল্লাহর দাস হবে, তাতে সে কোন মতেই উন্নাসিকতা প্রদর্শন করে না এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তাগণও নয়,[৩১] বস্তুতঃ যারা তাঁর দাসত্ব (ইবাদত) করতে উন্নাসিকতা প্রদর্শন করে ও অহংকার করে, তিনি তাদের সকলকে অচিরেই তাঁর নিকট একত্র করবেন।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً (١٧٣)

(১৭৩) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তিনি তাদেরকে পূর্ণ পুরস্কার দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দেবেন,[৩২] কিন্তু যারা উন্নাসিকতা প্রদর্শন করে ও অহঙ্কার করে[৩৩] তাদেরকে তিনি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করবেন[৩৪] এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের জন্য তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً (١٧٤)

(১৭৪) হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসে পৌঁছেছে[৩৫] এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতিঃ অবতীর্ণ করেছি।[৩৬]

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً (١٧٥)

(১৭৫) অতঃপর যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে ও তাঁকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে, তাদেরকে তিনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশাধিকার প্রদান করবেন এবং তাঁর নিকট পৌঁছনোর জন্য তাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন।

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا

(১৭৬) লোকেরা তোমার নিকট বিধান জানতে চায়। বল, আল্লাহ তোমাদেরকে পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে বিধান জানাচ্ছেন; কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগিনী থাকে, তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ[৩৭] এবং সে (ভগিনী) যদি সন্তানহীনা হয়, তবে তার ভাই

---

(৩১) ঈসা ﷺ-এর মত কেউ কেউ ফিরিশ্তাগণকে আল্লাহর শরীক মনে করত। অথচ আল্লাহ বলেন, এরা সকলেই আল্লাহর বান্দা এবং তাতে তাদের কোন রকম অস্বীকৃতি নেই। তোমরা তাদেরকে কোন ভিত্তির উপর (বা কি দেখে) আল্লাহর অংশীদার কিংবা আল্লাহ মনে করছ?

(৩২) উক্ত আয়াতে 'বেশী দেওয়া'-এর ব্যাখ্যায় কতক উলামা বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন এবং সুপারিশের অনুমতি পাওয়ার পর আল্লাহ যাদের ব্যাপারে অনুমতি দেবেন, তাঁরা শুধুমাত্র তাদের জন্যেই সুপারিশ করবেন।

(৩৩) অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে বিরত থাকে এবং সে ব্যাপারে অস্বীকার ও অহংকার প্রদর্শন করে।

(৩৪) যেমন অন্যত্র বলেছেন, {إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আল্লাহর ইবাদতে অস্বীকার ও অহংকার প্রদর্শন করে, তারা অচিরে লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা গাফির ৬০)

(৩৫) برهان বলা হয় এমন অকাট্য ও স্পষ্ট প্রমাণকে যার পর আর কোন আপত্তি থাকার অবকাশ নেই এবং এমন অকাট্য প্রমাণ যার দ্বারা সন্দেহ নিরসন হয়। আর এই কারণেই পরবর্তীতে একে 'নূর' বা জ্যোতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

(৩৬) এই আয়াতে 'নূর' (জ্যোতি)র অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'কুরআন কারীম' যা কুফর ও শির্কের অন্ধকারের মাঝে হিদায়াতের আলো এবং ভ্রষ্টতার ঘুরপাকে সরল ও সোজা পথ এবং আল্লাহর মজবুত ও শক্ত রজ্জু। সুতরাং এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতের হকদার হবে।

(৩৭) 'كَلَالَة' শব্দের তাৎপর্য (১২নং আয়াতে) পার হয়ে গেছে যে, ঐ মৃতব্যক্তি যার না পিতা আছে, না পুত্র। এখানে পুনরায় তার মীরাসের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কোন কোন উলামাগণ 'কালালাহ' এর তাৎপর্যে বলেন, 'কালালাহ' ঐ ব্যক্তি যে একমাত্র পুত্রহীন, অর্থাৎ পিতা বর্তমান। কিন্তু এই তাৎপর্য সঠিক নয়; বরং প্রথম তাৎপর্যটিই সঠিক। কেননা পিতার উপস্থিতিতে বোন পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারিণী (ওয়ারিস) হয় না। পিতা (মৃতের বোনের) জন্য (মীরাসের ব্যাপারে) অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। কিন্তু এখানে আল্লাহ বলেন, যদি তার বোন থাকে তাহলে সে অর্ধেক সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হবে। সুতরাং পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা গেল যে, 'কালালাহ' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার পিতা ও পুত্র উভয়ই থাকবে না। কেননা পুত্র না থাকার কথা স্পষ্ট উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। আর পিতা না থাকার প্রমাণ উক্তির ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত।

বিঃদ্রঃ- পুত্র বলতে, পুত্র ও পৌত্র উভয়কেই বলা হয়। অনুরূপ বোন, সহোদরা ও বৈমাত্রেয় উভয় বোনকেই বলা হয়।

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(١٧٦)

তার উত্তরাধিকারী হবে।[৩৮] আর দুই ভগিনী থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ,[৩৯] আর যদি ভাই-বোন উভয়ই থাকে, তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান।[৪০] তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এ আশংকায় আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

সূরা মায়িদাহ
(মদীনায় অবতীর্ণ)
সূরা নং ঃ ৫, আয়াত সংখ্যা ঃ ১২০

(অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

(১) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা অঙ্গীকার (ও চুক্তিসমূহ) পূর্ণ কর।[৪১] যে সব জন্তুর কথা তোমাদের উপর পাঠ করা হচ্ছে[৪২] তা ছাড়া (ক্ষুরবিশিষ্ট) চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য বৈধ করা হল,[৪৩] তবে ইহরাম অবস্থায় শিকারকে বৈধ মনে করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ নিজ ইচ্ছামত আদেশ প্রদান করে থাকেন।

(আইসারুত তাফাসীর) বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, 'কালালাহ'র কন্যার সঙ্গে তার বোন উভয়কেই অর্ধেক অর্ধেক সম্পদে শরীক করা হয়েছে। কিন্তু কন্যা ও পুতীনের বর্তমানে, কন্যা অর্ধেক, পুতীন একের ছয় অংশ ও বাকী একের তিন অংশ বোনকে দেওয়া হয়েছে। (ফাতহুল ক্বাদীর, ইবনে কাসীর) অতএব পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, মৃতব্যক্তির সন্তানের বর্তমানে বোন 'যাবীল ফুরূয' (নির্ধারিত অংশের অধিকারী) হিসাবে কিছু পাবে না। আবার ঐ সন্তান যদি পুত্র-সন্তান হয়, তাহলে বোন কোন অবস্থাতেই কিছুই পাবে না। তবে কন্যা-সন্তান হলে সে তার সাথে 'আস্বাবাহ' (অবশিষ্টাংশের অধিকারী) হওয়ার কারণে অবশিষ্ট সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হবে। একটি কন্যা থাকা অবস্থায় অর্ধেক ও একের অধিক কন্যা থাকা অবস্থায় একের তিন অংশের অধিকারিণী হবে।

(৩৮) যদি বাপ না থাকে তবে। যেহেতু ভাইয়ের চেয়ে বাপ সম্পর্কের দিক দিয়ে নিকটতর। সুতরাং বাপের বর্তমানে ভাই উত্তরাধিকারী হবে না। যদি ঐ 'কালালাহ' স্ত্রীর স্বামী অথবা বৈপিত্রেয় ভাই হয়, তাহলে তাদের অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদের অধিকারী ভাই হবে। (ইবনে কাসীর)

(৩৯) এই বিধানই দুই-এর অধিক বোনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থ এই দাঁড়াল যে, যদি 'কালালাহ' ব্যক্তির দুই অথবা দুই-এর অধিক বোন থাকে, তাহলে তারা সমস্ত মালের দুই তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী হবে।

(৪০) অর্থাৎ, 'কালালাহ' ব্যক্তির ওয়ারিসগণ যদি পুরুষ ও মহিলা উভয়ই হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে 'এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান' নিয়ম অনুযায়ী সম্পদ বন্টন হবে। (যেমন ছেলে-মেয়ের ক্ষেত্রে হয়।)

(৪১) 'عقود' এটা 'عقد' এর বহুবচন। যার আভিধানিক অর্থ গিরা লাগানো। এ শব্দ কোন বস্তু (দড়ি, সূতা, চুল ইত্যাদি)তে গিরা বাঁধার অর্থেও ব্যবহার হয়; যেমন অঙ্গীকার ও চুক্তি করার অর্থেও ব্যবহার হয়। এখানে এর অর্থ, আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান যা মানুষের উপর আরোপ করা হয়েছে। অনুরূপ লোকেরা ব্যবহারিক জীবনে নিজেদের মধ্যে যে অঙ্গীকার ও চুক্তি করে, তাকেও বুঝানো হয়েছে। উভয়ই পালন ও পূর্ণ করা আবশ্যিক।

(৪২) بهيمة চতুষ্পদ জন্তুকে বলা হয়। إبهام — بهم ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। কেউ কেউ বলেন, এদের বাকশক্তি, জ্ঞান ও বোধশক্তিতে যেহেতু إبهام (রুদ্ধতা) আছে, তার জন্য এদেরকে بهيمة বলা হয়েছে। أَنْعَامٌ উট, গরু, ছাগল ও ভেঁড়া বা দুম্বাকে বলা হয়। কেননা এদের গতি ও চালচলনে نعومة (নম্রতা) থাকে। الأنعام। بهيمة (চতুষ্পদ জন্তু) নর ও মাদী মিলে আট প্রকার; যা সূরা আনআম ১৪৩নং আয়াতে বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া যে সব পশুকে অহশী, জংলী, বন্য বা বুনো বলা হয়; যেমন হরিণ, নীল গাই ইত্যাদি, যেগুলো সাধারণতঃ শিকার করা হয়, সেগুলোও বৈধ। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় এগুলো ও অন্যান্য পাখী শিকার করা নিষেধ। সুন্নাহতে বর্ণিত নীতি অনুসারে যে পশু শিকারী দাঁতবিশিষ্ট এবং যে পাখী শিকারী নখবিশিষ্ট নয় তা হালাল। যেমন সূরা বাক্বারার ১৭৩নং আয়াতের টীকায় এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। শিকারী দাঁতবিশিষ্ট পশু বলতে সেই পশু উদ্দিষ্ট, যে তার শিকারী বা ছেদক দাঁত দ্বারা শিকার ধরে ও ফেড়ে খায়; যেমন বাঘ (সিংহ, চিতা, নেকড়ে), কুকুর প্রভৃতি। আর শিকারী নখবিশিষ্ট পাখী বলতে সেই পাখী উদ্দিষ্ট, যে তার ধারালো নখর দ্বারা শিকার ধরে; যেমন শকুনি, বাজ, ঈগল, চিল, কাক ইত্যাদি।

(৪৩) এর বিস্তারিত বিবরণ ৩নং আয়াতে আসছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

(২) হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহর নিদর্শনের,[৪৪] পবিত্র মাসের,[৪৫] হজ্জে যবেহযোগ্য কুরবানীর পশু, গলদেশে কিছু বেঁধে চিহ্নিত করে কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর[৪৬] এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র গৃহ-অভিমুখীদের[৪৭] পবিত্রতার অবমাননা করো না। যখন তোমরা ইহরাম-মুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার।[৪৮] তোমাদেরকে পবিত্র মসজিদে বাধা দেবার ফলে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে।[৪৯] সৎ কাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না।[৫০] আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ

(৩) তোমাদের জন্য হারাম (অবৈধ) করা হয়েছে মৃত পশু, রক্ত ও শূকর-মাংস, আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশু,[৫১] শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্তু,[৫২] ধারবিহীন কিছু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে

([৪৪]) شعائر শব্দটি شعيرة এর বহুবচন। যার ভাবার্থ, আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ও সম্মানীয় বস্তুসমূহ। (অর্থাৎ, যাদের মর্যাদা ও সম্মান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত)। কিছু উলামাগণ মনে করেন যে, এই মর্যাদাযোগ্য ও সম্মানীয় বস্তুগুলি ব্যাপক। কিছু উলামাগণের নিকট হজ্জ ও উমরার ইবাদত ও স্থানসমূহ উদ্দিষ্ট। অর্থাৎ, তার অমর্যাদা ও অসম্মান করো না। অনুরূপ হজ্জ ও উমরাহ পালনের ব্যাপারে অপরকে বাধা দিয়ো না। কেননা এটাও এক প্রকার অমর্যাদা ও অসম্মান প্রদর্শন।

([৪৫]) الشهر الحرام একবচন বলে শ্রেণী উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, নিষিদ্ধ, পবিত্র বা সম্মানীয় শ্রেণীর চারটি মাস (অর্থাৎ, রজব, যুল-ক্বা'দাহ, যুল-হিজ্জাহ ও মুহার্রম) এই মাসগুলির মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা কর এবং তাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করো না। কেউ কেউ মনে করেন যে, নিষিদ্ধ ও সম্মানীয় মাস শুধু যুল-হিজ্জাহ মাস। আবার কেউ মনে করেন যে, উক্ত নির্দেশ কুরআনের এই আয়াত (فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ) (অর্থাৎ, মুশরিকদেরকে যখন যেথায় পাবে হত্যা কর) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অথচ রহিত মনে করার কোন প্রয়োজনই হয় না। কারণ, উভয় নির্দেশ নিজ নিজ জায়গায় বহাল আছে; উভয়ের মধ্যে কোন রকম পরস্পরবিরোধ নেই।

([৪৬]) هَدْيٌ হাদঈ ঐ পশুকে বলা হয়, যাকে কুরবানী দেওয়ার জন্য হাজীগণ সঙ্গে ক'রে হারামে নিয়ে যেতেন। قلائد শব্দটি قلادة শব্দের বহুবচন। যার অর্থ গলায় ঝুলানো কিছু। আর এখানে হজ্জ ও উমরাহর সময় কুরবানীযোগ্য পশুকে বুঝানো হয়েছে, যাদের গলায় আলামত ও চিহ্নের জন্য জুতা বা ফিতা বেঁধে দেওয়া হত। (যাতে লোকে বুঝতে পারে যে, এটা কুরবানীর পশু)। সুতরাং قلائد এর ভাবার্থ হল, ঐ সমস্ত পশু, যেগুলিকে কুরবানী করার জন্য মক্কার হারামে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা 'হাদঈ'র অতিরিক্ত তাকীদ। উদ্দেশ্য হল, ঐ সমস্ত পশুকে কেউ যেন ছিনতাই না করে এবং হারাম পর্যন্ত পৌঁছনোর ব্যাপারে কেউ যেন কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে।

([৪৭]) অর্থাৎ, হজ্জ ও উমরাহর নিয়তে কিংবা ব্যবসা বাণিজ্য ও কর্মের উদ্দেশ্যে হারামের যাত্রীদের জন্য প্রতিবন্ধকতা ও সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি করো না। কোন কোন ভাষ্যকারের মন্তব্য হল, এই বিধান ঐ সময়ের জন্য ছিল, যখন মুসলমান ও মুশরিকগণ একত্রে হজ্জ ও উমরাহ পালন করত। কিন্তু যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল; (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) অর্থাৎ, মুশরিকরা অপবিত্র, সুতরাং তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়। (সূরা তাওবা ২৮ নং আয়াত) তখন এই আয়াত মুশরিকদের ক্ষেত্রে রহিত বা মানসুখ হয়ে গেল। আবার কোন কোন ভাষ্যকারের মতে এই আয়াতের বিধান রহিত নয় এবং এই হুকুম বা বিধান মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। (অর্থাৎ, তোমরা হারামের মুসলিম যাত্রীদের জন্য প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর খাড়া করো না।) (ফাতহুল ক্বাদীর)

([৪৮]) আলোচ্য আয়াতে আজ্ঞাসূচক ক্রিয়াটি অনুমতি বা জায়েযের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ; যখন ইহরাম খুলে দেবে (অর্থাৎ হালাল হয়ে যাবে), তখন তোমাদের জন্য শিকার করা বৈধ।

([৪৯]) অর্থাৎ; মুশরিকরা তোমাদেরকে ৬ষ্ঠ হিজরীতে মসজিদে হারামে যেতে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু তাদের বাধাদানের কারণে তোমরা তাদের সাথে সীমালংঘনমূলক ও অন্যায় আচরণ করবে না। শত্রুদের সাথেও ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা অবলম্বনের সবক ও শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

([৫০]) এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি, যা প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি পদক্ষেপে পথপ্রদর্শন করতে পারে। হায়! মুসলিমরা যদি এই মৌলিক নীতি নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারত!

([৫১]) এখান থেকে ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ বা হারামকৃত (পশুর) ব্যাপারে আলোচনা শুরু হচ্ছে, যার ইঙ্গিত সূরার প্রারম্ভে দেওয়া হয়েছে। আয়াতের এই অংশটুকু সূরা বাক্বারাতে উল্লেখ হয়েছে। (দেখুন আয়াত নং ১৭৩)

([৫২]) যাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে অথবা নিজেই কোনভাবে ফাঁস লাগা অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে, উভয়

لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ

মৃত জন্তু,(৫৩) পতনে মৃত জন্তু,(৫৪) শৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু(৫৫) এবং হিংস্র পশুর খাওয়া জন্তু;(৫৬) তবে তোমরা যা যবেহ দ্বারা পবিত্র করেছ তা ছাড়া।(৫৭) আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তা(৫৮) এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা,(৫৯) এ সব পাপকার্য। আজ অবিশ্বাসিগণ তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং

অবস্থায় এই মৃত (পশু ভক্ষণ) করা হারাম।

(৫৩) অর্থাৎ, পাথর অথবা লাঠি অথবা অন্য কোন জিনিস দ্বারা আঘাত করার কারণে বিনা যবেহতে মারা গেছে। জাহেলী যুগে এই সমস্ত পশুকে (হালাল মনে ক'রে) ভক্ষণ করা হত। ইসলামী শরীয়তে তা নিষেধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। **বন্দুকের শিকার**; বন্দুক দ্বারা শিকার করা হয়েছে এমন পশুর ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাওকানী (রঃ) বন্দুক দ্বারা শিকার করা পশুর ব্যাপারে একটি হাদীস থেকে প্রমাণ উল্লেখ ক'রে তা হালাল বলেছেন। অর্থাৎ (শিকারী) যদি 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে গুলি ছুঁড়ে এবং যবেহ করার পূর্বেই শিকার মারা যায়, তাহলে তাঁর মতানুসারে তা ভক্ষণ করা বৈধ। (ফাতহুল ক্বাদীর) (অন্য মতে, যে বন্দুকের গুলি শিকারের দেহ ভেদ ক'রে যায়, চামড়া কেটে ফেলে রক্তপাত ঘটায় সে বন্দুকের শিকার হালাল। পক্ষান্তরে ভেদ না ক'রে কেবল আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা গেলে তা খাওয়া বৈধ নয়।) *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৫/৫১১)*

(৫৪) (ঐ পশু) যে কোনভাবে পড়ে অথবা কেউ পাহাড় বা অন্য কোন উঁচু জায়গা থেকে ধাক্কা মারার কারণে পড়ে গিয়ে মারা যায়।

(৫৫) نطيحة ، منطوحة ঐ পশুকে বলা হয়; যাকে অন্য পশু শিং দ্বারা ধাক্কা মেরেছে বা শিং-লড়ায়ে বিনা যবাইয়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

(৫৬) অর্থাৎ সিংহ, চিতা ও নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি (শিকারী বা ছেদক দাঁতবিশিষ্ট) হিংস্রজন্তু যদি কোন শিকারকে নিজে খাওয়ার উদ্দেশ্যে ধরার ফলে মৃত্যু হয়েছে (এমন পশু)। জাহেলী যুগে এই ধরণের মৃত জানোয়ার খাওয়া হত। (কিন্তু ইসলাম এই ধরণের মৃত পশু খাওয়া হারাম ক'রে দিয়েছে।)

(৫৭) অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণের নিকটে এই ব্যতিক্রম পূর্বে উল্লিখিত শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্তু, ধারবিহীন কিছু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুর খাওয়া জন্তুর ব্যাপারে। অর্থাৎ, ব্যতিক্রম হল, যদি ঐ সকল পশুকে তোমরা এমন অবস্থায় পাও যে, তার মৃত্যু হয়নি; এখনো জীবিত আছে, তারপর তাকে শরয়ী পদ্ধতিতে যবেহ কর, তাহলে তোমাদের জন্য (ঐ পশু) খাওয়া বৈধ হবে। জীবিত থাকার চিহ্ন হল, যবেহ করার সময় যেন তার হাত-পা নড়ে ওঠে। কিন্তু ছুরি চালানোর সময় যদি এই অবস্থা না হয়, তাহলে জানতে হবে সে পশুটি মৃত। যবেহর শরয়ী পদ্ধতি হল, 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে ধারালো ছুরি দ্বারা এমনভাবে তার গলায় পেঁচাতে হবে যেন তার সমস্ত মোটা শিরাগুলি কেটে যায়। যবেহ ছাড়াও শরীয়তে 'নহর' করা বৈধ; যার পদ্ধতি হল, পশু দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সিনায় ছুরি (বা বর্শা) দ্বারা আঘাত করতে হবে; যাতে তার কণ্ঠনালী ও রক্তবাহী বিশেষ শিরা কেটে যায় এবং সমস্ত রক্ত প্রবাহিত হয়ে যায়।

(৫৮) মুশরিকগণ তাদের পূজ্যপ্রতিমার নিকটে পাথর বা অন্য কিছু স্থাপন ক'রে একটি নির্দিষ্ট জায়গা বানিয়ে নিত; যাকে نصب (বেদী, থান বা আস্তানা) বলা হত। আর সেই স্থানে মানত ও নযর মানা পশু ঐ পূজ্যপ্রতিমার নামে বলি দিত। অর্থাৎ, এটি {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ)এরই একটি ধরন। সুতরাং এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আস্তানা, কবরস্থান ও দর্গায় গিয়ে লোকেরা নিজের মনস্কামনা পূরণ করার জন্য এবং কবরস্থ বুযুর্গের সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য যে পশু (মুরগী, ছাগল ইত্যাদি) যবেহ বা উৎসর্গ করে কিংবা পোলাও বা (সিন্নি, মিঠাই) খাবার বন্টন করে, তা ভক্ষণ করা হারাম। আর এ সব আল্লাহর বাণী ঃ {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} এর শামিল।

(৫৯){وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ} এই অংশের দুটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে ; (ক) তীরের মাধ্যমে বন্টন করা (খ) তীরের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করা। প্রথম অর্থের ব্যাপারে বলা হয় যে, জুয়া ইত্যাদিতে যবেহকৃত পশুর মাংস বন্টনের ক্ষেত্রে উক্ত তীর (লটারী হিসাবে) ব্যবহার করা হত। যার ফলে কেউ প্রাপ্য অংশের চাইতে বেশী পেত, আবার কেউ সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হত। দ্বিতীয় অর্থের ব্যাপারে বলা হয় যে, বিশেষ তীর হত, তারা কোন কর্মের প্রারম্ভে তার মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করত। তারা তিন ধরণের তীর তৈরী করে রেখেছিল। তার মধ্যে একটিতে (افْعَلْ) অর্থাৎ 'কর' এবং দ্বিতীয়টিতে (لاَ تَفْعَلْ) অর্থাৎ 'করো না' লিখা থাকত। আর তৃতীয়টিতে কোন কিছু লেখা থাকত না। ভাগ্য পরীক্ষার সময় যদি প্রথম তীরটি (যাতে 'কর' লেখা আছে) বের হত, তাহলে তারা সে কর্মটি সম্পাদন করত, যদি দ্বিতীয় তীরটি (যাতে 'করো না' লেখা আছে) বের হত, তাহলে তারা সে কর্মটি সম্পাদন করত না, আর যদি তৃতীয় তীরটি (যাতে কোন কিছু লেখা থাকত না) বের হত, তাহলে তারা পুনরায় ভাগ্য পরীক্ষা করত। আর এটাও এক ধরণের গণকের কাজ এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনারই একটি চিত্র মাত্র। এই জন্য (ইসলামে) একে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। استقسام এর অর্থ হল, ভাগ্য পরীক্ষা করা।

الإِسْلامَ دِيناً فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)

ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম। তবে যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় (নিষিদ্ধ জিনিষ খেতে) বাধ্য হয়; কিন্তু ইচ্ছা ক'রে পাপের দিকে ঝুঁকে না, তাহলে (তার জন্য) আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬০]

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)

(৪) লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী কী বৈধ করা হয়েছে? বল, সমস্ত ভাল (পবিত্র) জিনিস তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে[৬১] এবং শিকারী পশুপক্ষী যেগুলোকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ; যেভাবে আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন[৬২] -ঐ (শিক্ষা দেওয়া পশুপক্ষী)গুলো যা তোমাদের জন্য ধরে আনে তা ভক্ষণ কর এবং (তাদেরকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময়) আল্লাহর নাম নাও।[৬৩] আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

(৫) আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস বৈধ করা হল, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের (যবেহকৃত) খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ[৬৪] ও তোমাদের (যবেহকৃত) খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ এবং বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারীগণ ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীগণ (তোমাদের জন্য বৈধ করা হল);[৬৫] যদি তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান ক'রে বিবাহ কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নীরূপে গ্রহণ করার জন্য নয়। আর যে কেউ ঈমানকে অস্বীকার করবে তার কর্ম নিষ্ফল এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا

(৬) হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে,

---

(৬০) এখানে ক্ষুধার শেষ পর্যায়ের অবস্থায় উল্লিখিত হারাম খাদ্য ভক্ষণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, তবে তাতে যেন আল্লাহর অবাধ্যাচরণ উদ্দেশ্য না হয় এবং সীমালঙ্ঘন করা না হয়। অর্থাৎ প্রাণ বাঁচানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন শুধুমাত্র ততটুকু ছাড়া বেশী যেন ভক্ষণ করা না হয়।

(৬১) এখানে ঐ সমস্ত জিনিসের কথা উল্লেখ হয়েছে, যেগুলি বৈধ বা হালাল। শরীয়তের একটি মূলনীতি হল, প্রত্যেক হালাল জিনিস পবিত্র ও উপাদেয়। আর প্রত্যেক হারাম জিনিস নোংরা ও অপবিত্র।

(৬২) جَوَارِحٌ শব্দটি جَارِحٌ শব্দের বহুবচন, যা উপার্জনকারী অর্থে ব্যবহার হয়। এখানে এর ভাবার্থ হল, শিকারী কুকুর, বাজপাখী, শিক্রে পাখী, চিতা এবং অন্যান্য শিকারী পাখী ও হিংস্রজন্তু। مكلبين এর সারমর্ম হল; শিকারের উপর ছাড়ার পূর্বে যাকে শিকার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন, যখন শিকার করার জন্যে তাকে প্রেরণ করা হবে, তখন সে দৌড়ে যাবে। আবার যখন তাকে থামতে বলা হবে, তখন সে থেমে যাবে। যখন তাকে ডাকা হবে, তখন সে (কাল বিলম্ব না ক'রে) ফিরে আসবে।

(৬৩) (উপরে উল্লিখিত) এই শিক্ষিত শিকারী জন্তুর শিকার করা পশু-পাখী দুটি শর্ত সাপেক্ষে খাওয়া হালাল বা বৈধ। (ক) শিকারে প্রেরণ করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। (খ) শিকারী পশু শিকার করা জিনিস (পশু বা পাখী) মালিকের জন্য রেখে দিবে এবং তার অপেক্ষা করবে; নিজে তা ভক্ষণ করবে না। যদিও সে শিকারকৃত পশু বা পাখীকে মেরে ফেলেছে, তবুও তা খাওয়া হালাল এই শর্তে যে, সে যেন শিকারের ব্যাপারে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয় এবং তাকে প্রেরণ করার সময় তার সাথে অন্য কোন পশু শরীক না থাকে। (সহীহ বুখারী 'যবেহ' অধ্যায় ও মুসলিম 'শিকার' অধ্যায়)

(৬৪) আহলে কিতাবদের যবেহকৃত সেই পশু হালাল বা বৈধ যার রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে। অন্যথা তাদের মেশিন দ্বারা যবেহকৃত পশু হালাল নয়। কেননা তাতে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার যে শর্ত রয়েছে তা বিলুপ্ত।

(৬৫) এখানে আহলে কিতাবদের (ঈয়াহুদী ও খ্রিষ্টান) মহিলাকে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়ার সাথে সাথে প্রথমতঃ এই শর্ত লাগানো হয়েছে যে, তাকে পবিত্রা (সতী) হতে হবে; যে শর্ত আজকাল অধিকাংশ আহলে কিতাবদের মহিলাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, যারা ঈমানের সাথে কুফরী (অস্বীকার) করে, তাদের আমল নষ্ট হয়ে যায়। এখানে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, এমন মহিলাকে বিবাহ করার ফলে যদি ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে খুবই ক্ষতির (সম্পদ) ক্রয় করা হবে। বর্তমানে আহলে কিতাবদের মহিলাদের বিবাহ করার ফলে ঈমান যে চরমতম ক্ষতির শিকার হবে, তা বর্ণনা করার অপেক্ষা রাখে না। অথচ ঈমান বাঁচানো ফরয কর্তব্য। একটি অনুমতিপ্রাপ্ত কর্মের জন্য ফরয কর্মকে বিপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন করা যেতে পারে না। কেননা এই অনুমতিপ্রাপ্ত কর্মটি ততক্ষণ পর্যন্ত কর্মে বাস্তবায়ন করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত উপরে উল্লিখিত দু'টি জিনিস (অসতীত্ব ও ঈমানের সাথে কুফরী) বিলুপ্ত না হয়েছে। এ ছাড়া অধুনা কালের আহলে কিতাবরা তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে অসচেতন; বরং সম্পর্কহীন ও বিদ্রোহী। এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা কি আসলেই আহলে কিতাবের মধ্যে গণ্য হবে? (আল্লাহই ভালো জানেন।)

وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)

তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর[৬৬] এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর[৬৭] এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর।[৬৮] আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল ক'রে) পবিত্র হও।[৬৯] যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর।[৭০] আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না,[৭১] বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান,[৭২] যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٧)

(৭) তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর এবং সেই অঙ্গীকারকেও তোমরা স্মরণ কর, যার দ্বারা তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছিলেন, যখন তোমরা বলেছিলে, 'শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।' আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরে যা আছে, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

---

(৬৬) 'মুখমন্ডল ধৌত কর' অর্থাৎ, একবার, দুইবার অথবা তিনবার ক'রে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা, কুল্লী করা বা কুলকুচা করা অতঃপর নাকের ভিতরে পানি টেনে নিয়ে নাক ঝাড়ার পর -- যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মুখমন্ডল ধৌত করার পর দুই হাত (আঙ্গুলের ডগা হতে) কনুইসহ ধৌত করতে হবে।

(৬৭) পুরো মাথা মাসাহ করতে হবে। যেমনটি হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, (দুই হাতকে ভিজিয়ে আঙ্গুলগুলিকে মুখোমুখি ক'রে) মাথার সামনের দিক থেকে (যেখান থেকে চুল গজানো শুরু হয়েছে সেখান) থেকে পিছন দিক (গর্দানের চুল যেখানে শেষ হয়েছে সেখান) পর্যন্ত, তারপর সেখান থেকে শুরু ক'রে সামনের দিকে নিয়ে এসে যেখান থেকে শুরু করেছিল সে পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। ঐ সঙ্গে কানও মাসাহ করতে হবে। যদি মাথার উপর পাগড়ি বা শিরস্ত্রাণ থাকে, তাহলে হাদীসের নির্দেশানুসারে মোজার উপর মাসাহর মত তার উপরেও মাসাহ বৈধ। (মুসলিম ঃ পবিত্রতা অধ্যায়) মাসাহ সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীসে একবার মাসাহ করাই যথেষ্ট বলা হয়েছে।

(৬৮) أَرْجُلَكُمْ এর সংযোগ وُجُوهَكُمْ এর সঙ্গে, যার ভাবার্থ হচ্ছে; পায়ের গাঁট বা গোড়ালির উপরের হাড় পর্যন্ত ধৌত কর। পক্ষান্তরে পায়ে যদি চামড়া বা কাপড়ের মোজা থাকে (এবং তা যদি ওযু থাকা অবস্থায় পরিধান করা হয়), তাহলে হাদীসের নির্দেশানুসারে পা ধোয়ার পরিবর্তে মোজার উপর নিয়মিত মাসাহ করা বৈধ।

আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী ঃ (ক) ওযু থাকলে পুনরায় ওযু করা জরুরী নয়। তবে প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুনভাবে ওযু করা উত্তম। (খ) ওযু করার পূর্বে নিয়ত করা ফরয। (গ) ওযু করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলা জরুরী। (ঘ) দাড়ি ঘন বা জমাট হলে তা খেলাল করতে হবে। (ঙ) ওযুর অঙ্গগুলিকে পর্যায়ক্রমে ধৌত করতে হবে। (চ) একটি অঙ্গ ধোয়ার পর দ্বিতীয় অঙ্গ ধোওয়ায় যেন দেরী না হয়; বরং একের পর এক যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে ধৌত করা হয়। (ছ) ওযুর অঙ্গগুলির মধ্যে কোন অঙ্গ যেন শুষ্ক না থেকে যায়, কেননা শুষ্ক থাকলে ওযু হবে না। (জ) ওযুর কোন অঙ্গকে তিনবারের বেশী যেন ধোওয়া না হয়, কারণ এটা সুন্নতের পরিপন্থী। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ফাতহুল ক্বাদীর ও আইসারুত তাফাসীর)

(৬৯) অপবিত্রতা; ঐ অপবিত্রতাকে বুঝানো হয়েছে, যা স্বপ্নদোষ অথবা স্ত্রী সহবাস (বা যৌনতৃপ্তির সাথে বীর্যপাতের) ফলে হয়। আর একই বিধান মহিলাদের মাসিক ও (প্রসবোত্তর) নিফাসজনিত অপবিত্রতারও। যখন মহিলার মাসিক বা নিফাস বন্ধ হয়ে যাবে, তখন পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা জরুরী। গোসলের পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করা বিধেয়; যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল ক্বাদীর ও আইসারুতর তাফাসীর)

(৭০) আয়াতের এই অংশের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং তায়াম্মুমের পদ্ধতি সূরা নিসার ৪৩নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। সহীহ বুখারীতে এই আয়াতের শানে নুযূল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন এক সফরে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র গলার হার বাইদা নামক স্থানে হারিয়ে যায়। তা খোঁজার জন্য তাঁদেরকে সেখানে থামতে হয়। ফজরের নামাযের জন্য তাঁদের নিকট পানি ছিল না এবং অনুসন্ধান করার পরও তাঁরা পানি সংগ্রহ করতে পারলেন না। এমতাবস্থায় (আল্লাহ তাআলা) এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন, যাতে তায়াম্মুম করার অনুমতি দেওয়া হল। উসাইদ বিন হুযাইর ﷺ এই আয়াত শুনে বললেন, 'হে আবু বাকরের বংশধর! তোমাদের কারণে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য বর্কত অবতীর্ণ করেছেন। আর এটা তোমাদের প্রথম বর্কত নয়। (বরং তোমরা মানুষের জন্য সর্বদাই বর্কতময়)।' (বুখারী ঃ সূরা মায়েদার তাফসীর)

(৭১) এই জন্যই তিনি তায়াম্মুমের অনুমতি প্রদান করেছেন।

(৭২) এই জন্যই হাদীসে ওযু করার পর দুআ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। দুআর বই-পুস্তক থেকে এই দুআ মুখস্থ ক'রে নিন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لله شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

(৮) হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্যদাতা হও।[৭৩] কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে।[৭৪] সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন।

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٩)

(৯) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার আছে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١٠)

(১০) আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ (١١)

(১১) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত প্রসারিত করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে তাদের হস্তকে প্রতিহত করেছিলেন[৭৫] এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর বিশ্বাসিগণের উচিত, কেবল আল্লাহর উপরেই ভরসা করা।

وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ

(১২) নিশ্চয় আল্লাহ বনী-ইস্রাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন[৭৬] এবং তাদের মধ্য হতে বারো জন নেতা নিযুক্ত

([৭৩]) প্রথম অংশের ব্যাখ্যা সূরা নিসার ১৩৫নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী ﷺ-এর নিকট ন্যায্য সাক্ষির কত বড় গুরুত্ব ছিল, তা এই ঘটনার দ্বারা অনুমান করা যায়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নু'মান বিন বাশীর ﷺ বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু হাদিয়া (দান) দিলেন, তা দেখে আমার মাতা বললেন, 'এই হাদিয়া বা দানের উপর যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে সাক্ষী না রাখবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হব না।' সুতরাং আমার পিতা রসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে, (ঘটনা বর্ণনা করলেন।) তখন রসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন; "তুমি তোমার সমস্ত সন্তানদেরকে অনুরূপভাবে হাদিয়া বা উপঢৌকন দিয়েছ কি?" প্রতি উত্তরে (আমার আব্বা) বললেন, 'না।' অতঃপর রসূল ﷺ বললেন, "আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মাঝে সমদৃষ্টিসম্পন্ন সুবিচার কর।" তিনি আরো বললেন, "আমি যুলুমের (অন্যায়ের) সাক্ষী হতে পারব না।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম / কিতাবুল হিবা বা দানপত্র নামক অধ্যায়)

([৭৪]) এ অংশের ব্যাখ্যা সূরা মায়িদার ২নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

([৭৫]) এই আয়াতের শানে নুযুল বা অবতীর্ণের কারণ সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্যকারগণ বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেছেন যেমন; (ক) একজন বেদুঈনের ঘটনা, কোন এক সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় রসূল ﷺ কোন এক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং তরবারিটিকে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। (সুযোগ বুঝে) ঐ বেদুঈন (তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে) তরবারিটি হস্তগত ক'রে ফেলল। অতঃপর তাঁর দিকে তরবারি উঁচিয়ে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আমার কবল থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে?' রসূল ﷺ নিশ্চিন্তে উত্তর দিলেন; 'আল্লাহ।' (অর্থাৎ আল্লাহ রক্ষা করবেন।) শুধু এতটুকু কথা বলতে যত দেরী, (অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে) তার হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেল। (খ) আবার কেউ বলেন যে, কা'ব বিন আশরাফ ও তার সহযোগীরা রসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবা ﷺগণের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ছল-চাতুরী করে তাঁদের ক্ষতি করার ষড়যন্ত্র করেছিল; যখন তিনি ও সাহাবাগণ তার বাড়িতে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু তাদের এ ষড়যন্ত্র আল্লাহ তাআলা যথাসময়ে তাঁর রসূল ﷺ-কে অবগত ক'রে ব্যর্থ ক'রে দেন। (গ) আবার কেউ বলেন যে, একজন মুসলমানের হাতে ভুলক্রমে আ'মেরী গোত্রের দুই ব্যক্তি খুন হয়েছিল। আল্লাহর রসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম ﷺ সহ রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে সন্ধিচুক্তি মোতাবেক সহযোগিতার কামনায় ইয়াহুদীদের গোত্র বানী নায়ীরের বস্তীতে গমন করেন। তিনি একটি দেওয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসেন। অপর দিকে তারা ষড়যন্ত্র করেছিল যে, উপর থেকে যাঁতার একটি পাথর ফেলে তাঁকে হত্যা করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল ﷺ-কে অহীর মাধ্যমে (তাদের সংকল্পের কথা) জানিয়ে দেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেন। সম্ভবতঃ উক্ত সমস্ত ঘটনার পরেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। কেননা একটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন কারণ ও পটভূমিকা থাকতে পারে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, আইসারুত তাফাসীর ও ফাতহুল ক্বাদীর)

([৭৬]) যখন আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে ঐ অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন, যা তিনি তাঁর রসূল ﷺ-এর মারফৎ গ্রহণ করেছেন। আর তাদেরকে হক প্রতিষ্ঠা ও ন্যায্য সাক্ষি প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং তাঁদেরকে তাঁর ঐ সকল পুরস্কার ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করালেন, যা তাঁদের জীবনে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে; বিশেষ ক'রে এই অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁদেরকে সত্য ও সঠিক পথে চলার তওফীক দান করেছেন। তখন এই স্থানে ঐ অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যা ইতিপূর্বে বানী ইস্রাঈলের নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যা পূরণ

عَشَرَ نَقِيباً وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً لأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١٢)

করেছিলেন[৭৭] আর বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তোমরা যদি নামায পড়, যাকাত দাও, আর আমার রসূলগণকে বিশ্বাস কর ও তাদেরকে সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তাহলে তোমাদের পাপরাশি অবশ্যই মোচন করব এবং নিশ্চয় তোমাদেরকে বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার দান করব; যার পাদদেশে নদীমালা প্রবাহিত। এর পরও তোমাদের মধ্যে যে অবিশ্বাস করবে সে সরল পথ হারাবে।'

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣)

(১৩) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদেরকে অভিসম্পাত করেছি ও তাদের হৃদয় কঠোর ক'রে দিয়েছি, তারা (তাওরাতের) বাক্যাবলীর পরিবর্তন সাধন ক'রে থাকে[৭৮] এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার একাংশ ভুলে গেছে।[৭৯] তুমি সর্বদা ওদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত[৮০] সকলেরই তরফ হতে বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পেতে থাকবে।[৮১] সুতরাং তুমি ওদেরকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর।[৮২] নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।

করতে তারা অকৃতকার্য প্রমাণিত হয়েছিল। এ যেন পরোক্ষভাবে মুসলিমদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমরা যেন বানী ইস্রাঈলের ন্যায় অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ শুরু ক'রে না দাও।

(৭৭) এটি ঐ সময়কার ঘটনা, যখন মূসা ﷺ দুর্দান্ত জাতি আমালেকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তিনি নিজ জাতির বারটি গোত্রের জন্য একজন ক'রে দলপতি নির্বাচন করেন। যাতে তারা তাদের স্বগোত্রের লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুত করে, তাদের নেতৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্বও পালন করে এবং তাদের অন্যান্য ব্যাপারেও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৭৮) অর্থাৎ, এত বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা এবং অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির পরেও বানী-ইস্রাঈল তা ভঙ্গ করে, যার ফলে তারা আল্লাহর অভিশাপের শিকার হয়। অভিশাপের পরিণাম ইহকালে এটাই প্রকাশ পায় যে, (এক) তাদের হৃদয় কঠোর ক'রে দেওয়া হয়। যার কারণে তাদের হৃদয় প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হয় এবং নবীগণের উপদেশবাণী তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। (দুই) আল্লাহর বাণীকে তারা হেরফের ও পরিবর্তন করে। এই পরিবর্তন দুই ধরনের ছিল, কখনও শব্দের পরিবর্তন, আবার কখনও অর্থের পরিবর্তন। আর তা এ কথার প্রমাণ যে, বুদ্ধি ও বুঝ-শক্তিতে বক্রতা এসেছিল এবং তাদের দুঃসাহসিকতা এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, আল্লাহর আয়াতকে পর্যন্ত হেরফের করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে, উম্মতে মুহাম্মাদিয়ারও কিছু লোক অন্তরের উক্ত কঠোরতা এবং আল্লাহর বাণীতে পরিবর্তন সাধন করা থেকে বাঁচতে পারেনি। মুসলমান দাবীদার কোন সাধারণ লোক নয়; বরং বিশিষ্ট লোক এবং মূর্খ নয়; বরং উলামা (শিক্ষিত) শ্রেণীর মানুষ, এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, উপদেশ ও নসীহত এবং আল্লাহর বিধানের স্মরণ দানও তাঁদের নিকট অর্থহীন। শ্রবণ করার পরও তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব বিস্তার করে না এবং যে ঔদাস্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতে তাঁরা নিমজ্জিত, তা থেকে তারা তওবা ও প্রত্যাবর্তন করে না। অনুরূপভাবে নিজেদের মনগড়া বিদআত ও কল্পনাপ্রসূত মতবাদ এবং (আয়াত ও সহীহ হাদীসের স্পষ্ট উক্তির) অপব্যাখ্যা প্রমাণ করার লক্ষ্যে দুঃসাহসিকতার সাথে আল্লাহর বাণীকে পরিবর্তন ক'রে ফেলে!

(৭৯) (তিন) আল্লাহর বিধানের উপর আমল করার ব্যাপারে তাদের তেমন কোন আগ্রহ ও কৌতূহল নেই; বরং সৎকর্মহীনতা ও কুকর্ম তাদের জাতীয় প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আর তারা হীনতার এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, না তাদের হৃদয় সুস্থ আছে, আর না তাদের প্রকৃতি সরল।

(৮০) এই অল্প সংখ্যক লোক ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে মুসলমান হয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা দশ থেকেও কম ছিল।

(৮১) অর্থাৎ, বিশ্বাসঘাতকতা বা খেয়ানত এবং প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও ধূর্তামি তাদের চাল-চলনে ও আচরণের একটি অংশে পরিণত হয়েছে, যার নমুনা আপনার সম্মুখে সব সময় পেশ হতে থাকবে।

(৮২) ক্ষমা ও মার্জনা করার নির্দেশ ঐ সময় দেওয়া হয়েছিল যখন জিহাদের অনুমতি ছিল না। পরবর্তীতে তা রহিত ক'রে তার স্থলে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} অর্থাৎ, তোমরা যুদ্ধ কর ঐ লোকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। (সূরা তাওবা ২৯) কিন্তু কিছু উলামাগণের নিকটে এই নির্দেশ রহিত হয়নি; বরং এটা একটা স্বতন্ত্র নির্দেশ বা হুকুম। আর অবস্থা ও কাল-পাত্র ভেদে (উল্লিখিত নির্দেশ) পালন করা যেতে পারে। পরন্তু এর মাধ্যমেও কতক সময় এমন পরিণাম সামনে আসে, যার জন্য যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ(١٤)

(১৪) এবং যারা বলে, 'আমরা নাসারা' (খ্রিষ্টান),[৮৩] তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল, তার একাংশ ভুলে বসে। সুতরাং আমি তাদের মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি।[৮৪] আর তারা যা করত, আল্লাহ অচিরেই তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥)

(১৫) হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! আমার রসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে, সে তার অনেক অংশ তোমাদের নিকট প্রকাশ করে[৮৫] এবং অনেক কিছু (প্রকাশ না ক'রে) উপেক্ষা ক'রে থাকে। অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট হতে জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে।[৮৬]

يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ

(১৬) যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এ (জ্যোতির্ময় কুরআন) দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন

---

(৮৩) نصارى (নাসারা) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে نصرة 'নুসরাহ' থেকে। যার অর্থ হচ্ছে, সাহায্য করা। ঈসা ﷺ-এর উক্তি {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ} অর্থাৎ, আল্লাহর দ্বীনে কে আমার সাহায্যকারী হবে? এর প্রত্যুত্তরে তাঁর কিছু ন্যায়-নিষ্ঠাবান অনুগত শিষ্য বলেছিলেন, {نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ} অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। এখান হতেই তাদের নাম হয়েছে 'নাসারা।' এরাও ইয়াহুদীদের মতই আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। এদের নিকট থেকেও আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কিন্তু তারা ঐ অঙ্গীকারের কোন পরোয়া করেনি। যার পরিণাম স্বরূপ তাদের হৃদয়ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে শূন্য এবং তাদের কর্ম মূল্যহীন হয়ে যায়।

(৮৪) এ হল আল্লাহর অঙ্গীকার হতে অপসরণ এবং আমল না করার শাস্তি যে, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের হৃদয়ে পারস্পরিক শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। সুতরাং খ্রিষ্টানরাও কয়েক ফির্কাতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যারা পারস্পরিক প্রচণ্ড ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করে, একে অপরকে 'কাফের' বলে থাকে এবং এক ফির্কা অন্য ফির্কার উপাসনালয়ে উপাসনা করে না। মনে হচ্ছে যে, মুসলিম উম্মাহর উপরেও ঐ ধরণের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ মুসলিমরাও বিভিন্ন ফির্কাতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, যাদের মাঝে প্রচণ্ড মতবিরোধ, মতানৈক্য, পারস্পরিক ঘৃণা, শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের প্রাচীর খাড়া হয়ে আছে। আল্লাহ রহম করুন।

(৮৫) অর্থাৎ, তারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেছে, রসূল ﷺ তা উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং যা তারা গোপন করেছিল, তা তিনি প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন। যেমন, বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর ছুঁড়ে মারার শাস্তিকে তারা গোপন করেছিল; যার বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

(৮৬) (نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ) এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা 'নূর ও কিতাবুন মুবীন' (জ্যোতি ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ) একই সাথে উল্লেখ করেছেন এবং এই দুইয়েরই উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন কারীম। কেননা এই দুইয়ের মধ্যে وَ সংযোজক অব্যয়টি পাশাপাশি দুই বিশেষ্যের ভিন্নতা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়নি; বরং অর্থের ভিন্নতা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এই অব্যয়টি আসলে ব্যাখ্যাকারী সংযোজক অব্যয়। যার স্পষ্ট প্রমাণ কুরআনের পরবর্তী আয়াত, যেখানে বলা হচ্ছে يَهْدِي بِهِ اللهُ অর্থাৎ তার দ্বারা আল্লাহ হিদায়াত করেন বা সুপথ দেখান। যদি نور ও كتاب আলাদা আলাদা জিনিস হত, তাহলে কুরআনের এই বাক্যটি এইরূপ হত, يَهْدِي بِهِمَا اللهُ অর্থাৎ, সর্বনামটি একবচন না হয়ে দ্বিবচন হত (ه একবচন না হয়ে هما দ্বিবচন হত এবং অনুবাদ 'এ দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন' না হয়ে) 'উভয় দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন' হত। কুরআনের এই বাক্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে গেল যে, 'নূর' ও 'কিতাবে মুবীন' উভয় থেকে উদ্দেশ্য 'কুরআন কারীম'। এ নয় যে, 'নূর' থেকে উদ্দেশ্য মুহাম্মাদ ﷺ আর 'কিতাবে মুবীন' থেকে উদ্দেশ্য কুরআন মাজীদ; যেমনটি বিদআত পন্থীদের ধারণা; যারা এই আকীদায় বিশ্বাসী যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর নূরের অংশ বিশেষ এবং যারা অস্বীকার করে যে, তিনি একজন মানুষ। (অথচ 'নূর' বলতে যে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে, তার প্রমাণ রয়েছে সূরা তাগাবুনের ৮নং আয়াতে। সেখানে মহান আল্লাহ বলেন, {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا} অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা ঈমান আনয়ন কর আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং সেই 'নূর' বা জ্যোতির প্রতি, যা আমি অবতীর্ণ করেছি।) অনুরূপ এই মনগড়া আকীদাকে সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে তারা একটি হাদীসও বর্ণনা ক'রে থাকে, "আল্লাহ সর্বপ্রথম নবী ﷺ-এর নূরকে সৃষ্টি করেন, তারপর তাঁর নূর থেকে সারা জগৎ সৃষ্টি করেন।" অথচ নির্ভরযোগ্য কোন হাদীসগ্রন্থে এই হাদীসটির উল্লেখ নেই। উপরন্তু এই হাদীসটি ঐ সহীহ হাদীসের পরিপন্থী, যাতে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, إن أول ماخلق الله القلم অর্থাৎ, সর্বপ্রথম আল্লাহ যা সৃষ্টি করেন, তা হল কলম। (তিরমিযী ও আবু দাউদ) (এ যুগের শ্রেষ্ঠ) মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানী (রঃ) বলেন, হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ এবং এটি সেই প্রসিদ্ধ হাদীস বাতিল হওয়ার প্রকাশ্য প্রমাণ, যাতে বলা হয়েছে, "আল্লাহ সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন হে জাবের!" (হাদীসটি বাতিল। দেখুন ঃ তা'লীক্বাতে মিশকাত ১/৩৪)

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ(١٦)

এবং নিজ অনুমতিক্রমে (কুফরীর) অন্ধকার হতে বার ক'রে (ঈমানের) আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(١٧)

(১৭) নিশ্চয় তারা অবিশ্বাসী (কাফের), যারা বলে, 'মারয়্যাম-তনয় মসীহই আল্লাহ।' বল, 'মারয়্যাম-তনয় মসীহ, তার মাতা এবং পৃথিবীর সকলকে যদি আল্লাহ ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁকে বাধা দেবার শক্তি কার আছে?' আকাশ ও ভূ-মন্ডলে এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে, তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৮৭]

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٨)

(১৮) ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা বলে, 'আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়।'[৮৮] বল, 'তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন?[৮৯] বরং তোমরা অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় তাঁরই সৃষ্ট মানুষ। যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন।[৯০] আর আকাশ-পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে, তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। আর তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।'

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٩)

(১৯) হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! রসূলগণের আগমন বন্ধ থাকার পর তোমাদের নিকট আমার রসূল (মুহাম্মাদ) এসেছে; সে তোমাদের নিকট (শরীয়ত) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে। যাতে তোমরা বলতে না পার যে, 'কোন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আমাদের নিকট আসেনি।' এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসেছে।[৯১] বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

---

(৮৭) এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজ অসীম ক্ষমতা ও পূর্ণ সার্বভৌমত্বের কথা বর্ণনা করেছেন। উদ্দেশ্য খ্রিষ্টানদের সেই আকীদা ও বিশ্বাসকে খন্ডন করা, যাতে তারা মনে করে যে, মসীহ ﷺ স্বয়ং আল্লাহ। 'মসীহ ﷺ স্বয়ং আল্লাহ' (যীশুই ঈশ্বর) এই আকীদায় বিশ্বাসী প্রথমে অল্প সংখ্যক লোক ছিল অর্থাৎ, খ্রিষ্টানদের একটি ফির্কাই ছিল, যারা 'ইয়াকূবিয়াহ' নামে পরিচিত। কিন্তু বর্তমানে তাদের প্রায় সকল ফির্কাই কোন না কোন দিক দিয়ে ঈসা ﷺ-কে আল্লাহ মনে ক'রে থাকে। এই জন্য খ্রিষ্টধর্মে ত্রিত্ববাদ অথবা ট্রিনিটির বিশ্বাস মূল ভিত্তি হিসাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। অথচ কুরআনে কারীমের এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোন নবী বা রসূলকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা প্রকাশ্য কুফরী। খ্রিষ্টানরা মসীহ ﷺ-কে আল্লাহ বানিয়ে এই কুফরী করেছে। যদি অন্য কোন ফির্কা বা দল অন্য কোন নবী বা রসূলকে মানুষ ও রসূল হওয়ার আসন থেকে উঠিয়ে আল্লাহর আসনে আসীন করে, তাহলে তারাও কুফরী করবে। (আমরা এই ভ্রান্ত আকীদা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)

(৮৮) ইয়াহুদীরা উযায়ের ﷺ-কে এবং খ্রিষ্টানরা ঈসা ﷺ-কে 'আল্লাহর পুত্র বলে' এবং তারা নিজেদেরকেও 'আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র' বলে দাবী করে। অনেকে বলেন, এখানে একটি শব্দ উহ্য আছে, আর তা হচ্ছে أتباء الله أبناء অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর পুত্রদ্বয় (উযায়ের ও ঈসা)এর অনুসারী। উল্লিখিত দুই অর্থের মধ্যে যে অর্থই নেওয়া হোক না কেন, তাতে তাদের গর্ব ও আস্ফালন এবং আল্লাহর উপর অনর্থক ভরসা প্রকাশ পায়; যা আল্লাহর নিকটে মূল্যহীন।

(৮৯) এই অংশে তাদের উল্লিখিত আস্ফালন ও গর্বকে ভিত্তিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বস্তুতঃপক্ষে তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহর প্রিয়পাত্র ও অভীষ্ট হও, তাহলে তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর। আল্লাহ তো সে ব্যাপারে তোমাদেরকে কোন জিজ্ঞাসাবাদই করবেন না। আর যদি তাই হয়, তাহলে তোমাদের কৃতপাপের কারণে কেন তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে আসছেন ও দিবেন? এর দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর দরবারে বিচার কেবল দাবীর ভিত্তিতে হয় না; আর তা কিয়ামতের দিনেও হবে না। বরং আল্লাহ ঈমান, পরহেযগারী ও সৎকর্ম দেখেন এবং দুনিয়াতেও তারই ভিত্তিতেই ফায়সালা করেন। আর কিয়ামতের দিনেও এই ভিত্তির উপরেই বিচার ফায়সালা করবেন।

(৯০) তথাপি এই শাস্তি অথবা ক্ষমার ফায়সালা আল্লাহর সেই নিয়ম মোতাবেকই হবে; যা পরিষ্কারভাবে তিনি বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, মুমিনগণের জন্য ক্ষমা এবং কাফের ও ফাসেকদের জন্য শাস্তি। সমস্ত মানুষের বিচার এই সাধারণ নীতি অনুসারেই হবে। হে আহলে কিতাবগণ! তোমরাও তাঁরই সৃষ্ট মানুষ। তোমাদের ব্যাপারে বিচার-ফায়সালা অন্য মানুষ থেকে ভিন্নতর কেন হবে?

(৯১) ঈসা ﷺ ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাঝে প্রায় ৫৭০ অথবা ৬০০ বছরের মত যে ব্যবধান, এই ব্যবধান কালকে 'ফাতরাহ' (দুই জন প্রেরিত রসূলের মধ্যবর্তী সময়-কাল) বলে। আহলে কিতাবদেরকে বলা হচ্ছে যে, এই ব্যবধান-কালের পর আমি

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنْ الْعَالَمِينَ (٢٠)

(২০) (স্মরণ কর) মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহ-প্রদত্ত অনুগ্রহকে স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের মধ্যে আম্বিয়া সৃষ্টি করেছেন ও তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন[৯২] এবং তোমাদেরকে এমন কিছু দান করেছেন, যা বিশ্বজগতে আর কাউকেও দান করেননি।[৯৩]

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢١)

(২১) হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি[৯৪] নির্দিষ্ট করেছেন (লিখে দিয়েছেন), তাতে তোমরা প্রবেশ কর[৯৫] এবং পশ্চাদপসরণ করো না,[৯৬] করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।'

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ(٢٢)

(২২) তারা বলল, হে মূসা! সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় রয়েছে এবং তারা সেই স্থান হতে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে কক্ষনো প্রবেশ করব না। তারা সেই স্থান হতে বের হয়ে গেলে তবেই আমরা প্রবেশ করব।'[৯৭]

সর্বশেষ রসূল মুহাম্মাদকে প্রেরণ করলাম। এবার তো তোমরা এ কথা বলার সুযোগ পাবে না যে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী নবী ও রসূল আসেননি।

(৯২) অধিকাংশ নবী-রসূল বানী ইসরাঈলের (বানী ইয়াকূবের) মধ্য হতেই আগমন করেছেন এবং তাঁদের সর্বশেষ নবী ছিলেন ঈসা ﷺ। আর নবী ও রসূলগণের সর্বশেষ নবী আগমন করেন বানী ইসমাঈলের মধ্য হতে মুহাম্মাদ ﷺ। অনুরূপভাবে বানী ইসরাঈলের মধ্যে বহু রাজা-বাদশাহর আবির্ভাব ঘটেছে এবং কোন কোন নবীকে আল্লাহ বাদশাহীও দান করেছিলেন; যেমন সুলাইমান ﷺ। আর এর অর্থ হল, নবুঅতের মতই বাদশাহীও আল্লাহ প্রদত্ত একটি অনুগ্রহ। অতএব সাধারণভাবে বাদশাহী বা রাজতন্ত্রকে খারাপ মনে করলে বড় ভুল হবে। যদি রাজতন্ত্র বা বাদশাহী কোন খারাপ জিনিস হত, তাহলে আল্লাহ কোন নবীকে রাজা-বাদশাহ বানাতেন না এবং এই বাদশাহীকে অনুগ্রহ ও নেয়ামত বলে উল্লেখ করতেন না। যেমনটি বর্তমানে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বুকচাপা (ভূত) এমনভাবে মানুষের মন ও মস্তিষ্কে চেপে ধরে আছে এবং পাশ্চাত্যের চতুররা এমনভাবে তাদেরকে যাদু করেছে যে, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার অন্ধভক্ত কেবল রাজনৈতিক নেতারাই নয়; বরং জুব্বা-পাগড়ী-ওয়ালারাও বটে। মোটকথা, রাজতন্ত্র বা শাহীতন্ত্র; যদি রাজা ও শাসক ন্যায়পরায়ণ ও আল্লাহ-ভীরু হন, তাহলে তা গণতন্ত্র থেকে হাজার গুণ উত্তম।

(৯৩) আয়াতের এই অংশটিতে ঐ সকল অনুগ্রহ ও অলৌকিক ঘটনাবলীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা বানী ইস্রাঈলকে দান করা হয়েছিল। যেমন, 'মান্ন ও সালওয়া'র অবতরণ, মেঘমালার ছায়াদান এবং ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তির জন্য সাগরের মাঝে রাস্তা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এই দিক দিয়ে এই জাতি নিজ যুগে মাহাত্ম্য ও মর্যাদায় শীর্ষস্থানে ছিল। কিন্তু শেষনবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের পর ঐ মাহাত্ম্য ও মর্যাদার অধিকারী শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদী হয়ে গেল। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} অর্থাৎ, তোমরাই মানবমণ্ডলীর জন্যে শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়রূপে সমুদ্ভূত হয়েছ। তবে হ্যাঁ, এই মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তখনই হওয়া যাবে, যখন পরে বর্ণিত অংশের উপর আমল করা হবে। আল্লাহ বলেন, {تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ} অর্থাৎ, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে, মন্দ কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। (সূরা আলে ইমরান ১১০) মহান আল্লাহর নিকট আকুল প্রার্থনা যে, তিনি যেন মুসলিম উম্মাহকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার তাওফীক দান করেন; যাতে তাঁরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে অক্ষয় ও অম্লান রাখতে পারে।

(৯৪) বানী ইসরাঈলের প্রধান পুরুষ ইয়াকুব ﷺ-এর বাসস্থান ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস (জেরুজালেম)। কিন্তু তাঁর পুত্র ইউসুফ ﷺ মিসরের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার পর তাঁরা সকলেই মিসরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। পরিশেষে মূসা ﷺ ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য গোপনভাবে রাতারাতি বানী ইস্রাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে চলে আসেন। কিন্তু সে সময় বায়তুল মুকাদ্দাসে আমালেকাদের শাসন ছিল, যারা এক বীর-বাহাদুর গোত্র রূপে পরিচিত ছিল। যখন মূসা ﷺ পুনরায় বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে বসবাস করার ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন তার জন্য ক্ষমতাসীন আমালেকাদের বিরুদ্ধে জিহাদ জরুরী ছিল। সুতরাং মূসা ﷺ নিজ গোত্রকে ঐ পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলেন এবং সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্যের সুসংবাদও শুনালেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বানী ইস্রাঈল আমালেকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হল না। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

(৯৫) এর উদ্দেশ্য, ঐ বিজয় ও সাহায্য; যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ জিহাদের শর্তে দিয়ে রেখেছিলেন।

(৯৬) অর্থাৎ জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ো না।

(৯৭) বানী ইস্রাঈলগণ আমালেকাদের বীরত্ব-প্রসিদ্ধির কারণে তাদের ভয়ে ভীতু হয়ে যায় এবং প্রথম ধাপেই শক্তি ও সাহস হারিয়ে ফেলে। ফলে তারা জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ে যায়। যার ফলস্বরূপ আল্লাহর রসূল মূসা ﷺ-এর হুকুমের কোন পরোয়া

قَالَ رَجُلانِ مِنْ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمْ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٣)

(২৩) তাদের মধ্যে দু'জন যারা (আল্লাহকে) ভয় করত, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বলল, 'তোমরা নগরদ্বারে প্রবেশ ক'রে তাদের মুকাবেলা কর, সেখানে প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে। আর তোমরা বিশ্বাসী হলে আল্লাহর উপরই নির্ভর কর।'[৯৮]

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (٢٤)

(২৪) তারা বলল, 'হে মূসা! তারা যত দিন সেখানে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না, সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব।'[৯৯]

قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (٢٥)

(২৫) সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অন্য কারো উপর আমার আধিপত্য নেই, সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফায়সালা করে দাও।'[১০০]

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (٢٦)

(২৬) (আল্লাহ) বললেন, 'তবে এ (ভূমি) চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ রইল। তারা ভূ-পৃষ্ঠে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে,[১০১] সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না।'[১০২]

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ

(২৭) আদমের দুই পুত্রের (হাবীল ও ক্বাবীলের) বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শোনাও,[১০৩] যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হল এবং অন্য জনের

করল না এবং আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতির প্রতি প্রত্যয় হল না। ফলে সেখানে যেতে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার ক'রে বসল।

(৯৮) মূসা ﷺ-এর জাতির মধ্যে কেবল এই দুই ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার ছিলেন, যাঁদের আল্লাহর শক্তি ও সাহায্যের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। তাঁরা জাতিকে বুঝাতে লাগলেন যে, তোমরা সাহস তো কর। তারপর দেখ, কেমন করে আল্লাহ তোমাদেরকে (ঐ শত্রুদের উপর) বিজয় দান করেন।

(৯৯) কিন্তু এ সত্ত্বেও বানী ইস্রাঈল হীনতর কাপুরুষতা, বেআদবী, অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ প্রকাশ করে (বিদ্রূপের ভঙ্গিতে) বলল যে, 'তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসলাম!' কিন্তু এর বিপরীত বদর যুদ্ধের সময়ে যখন সাহাবায়ে কেরাম ﷺগণের নিকট রসূল ﷺ পরামর্শ চাইলেন তখন তাঁরা সংখ্যায় কম ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামও অতি সামান্য থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য পূর্ণরূপে উৎসাহ ও সংকল্প প্রকাশ করলেন এবং এটাও বললেন যে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনাকে ঐ কথা কখনও বলব না, যে কথা মূসা ﷺ-এর সম্প্রদায় মূসা ﷺ-কে বলেছিল। (বুখারী ঃ মাগাযী ও তাফসীর অধ্যায়)

(১০০) এ কথায় অবাধ্য ও বিদ্রোহী জাতির মোকাবেলায় নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতা প্রকাশ এবং তাদের সাথে তাঁর সম্পর্কহীনতার ঘোষণাও রয়েছে।

(১০১) এই ভূ-পৃষ্ঠকে ময়দানে 'তীহ' বলা হয়। ('তীহ' গোলক-ধাঁধার ময়দানকে বলে।) এই ময়দানে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই জাতি নিজেদের বিদ্রোহের ও জিহাদ থেকে বিমুখতা অবলম্বন করার কারণে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এর পরেও (আল্লাহর পক্ষ থেকে) এই ময়দানে 'মান্ন' ও 'সালওয়া' অবতরণ হয়। যা (খেতে খেতে) বিরক্ত হয়ে তারা তাদের নবী (মূসা ﷺ)কে বলে, 'প্রতিদিন একই খাবার খাওয়ার কারণে আমাদের অরুচি হয়ে গেছে। অতএব আপনি আপনার প্রভুর নিকট দুআ করুন যে, তিনি যেন আমাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সবজী ও ডাল উৎপন্ন করেন।' এই ময়দানেই তাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া দান করা হয়। এখানেই মূসা ﷺ লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত করলে বারো গোত্রের জন্য বারোটি ঝর্ণা নিঃসৃত হয় এবং অনুরূপ তারা আরো বহুভাবে নিয়ামতপ্রাপ্ত হতে থাকে। পরিশেষে চল্লিশ বছর পর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তখন তারা বায়তুল মাক্বদিস প্রবেশ করে।

(১০২) নবী (মূসা ﷺ) দাওয়াত ও তাবলীগ করার পর যখন দেখেন যে, তাঁর গোত্র সোজা ও সরল পথ অবলম্বনে প্রস্তুত নয়; যার মধ্যে তাদের ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে, তখন প্রকৃতিগতভাবে তিনি বড় আক্ষেপ ও আন্তরিকভাবে দুঃখ-দুশ্চিন্তার শিকার হয়ে পড়েন। ঠিক একই অবস্থা মুহাম্মাদ ﷺ-এর হত, যা কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে মূসা ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, যখন তুমি তাবলীগের গুরুভার আদায় করেছ এবং আল্লাহর পয়গাম লোকদের নিকট পৌঁছে দিয়েছ, তুমি তোমার জাতিকে এক মহান সফলতার দ্বার প্রান্তে উপস্থিত করেছ, কিন্তু তারা তাদের হীনম্মন্যতা ও দুর্মতির কারণে তোমার কথা মান্য করে না, তখন তুমি তোমার কর্তব্য পালনের দায়িত্ব হতে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছ। সুতরাং তোমাকে এ ব্যাপারে দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এমন পরিস্থিতিতে দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়াটা একটা প্রকৃতগত ব্যাপার ছিল। কিন্তু সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, দাওয়াত ও তাবলীগের পর আল্লাহর নিকটে তুমি দায়িত্বমুক্ত।

(১০৩) আদম ﷺ-এর এই দুই পুত্রের নাম যথা; 'হা-বীল' ও 'ক্বা-বীল' ছিল।

أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٧)

কুরবানী কবুল হল না।[১০৪] (তাদের একজন) বলল, 'আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব।' (অপরজন) বলল, 'আল্লাহ তো সংযমীদের কুরবানীই কবুল ক'রে থাকেন।

لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (٢٨)

(২৮) আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি আমার প্রতি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি তোমার প্রতি হাত তুলব না, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালককে ভয় করি।

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (٢٩)

(২৯) তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং দোযখবাসী হও এই তো আমি চাই[১০৫] এবং এ হল যালেম (অনাচারী)দের কর্মফল।'

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٣٠)

(৩০) অতঃপর তার চিত্ত ভ্রাতৃ-হত্যায় তাকে উত্তেজিত করল, সুতরাং সে (কাবীল) তাকে (হাবীলকে) হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল।[১০৬]

فَبَعَثَ اللهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (٣١)

(৩১) অতঃপর আল্লাহ এক কাক পাঠালেন, যে তার ভায়ের শবদেহ কিভাবে গোপন করা যায়, তা দেখাবার উদ্দেশ্যে মাটি খনন করতে লাগল। সে বলল, 'হায়! আমি কি এ কাকের মতও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভায়ের শবদেহ গোপন করতে পারি?' অতঃপর সে অনুতপ্ত হল।

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ

(৩২) এ কারণেই বনী ইস্রাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার দন্ডদান উদ্দেশ্য ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণরক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।[১০৭] তাদের নিকট তো

([১০৪]) এই নযর বা কুরবানী কি উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়েছিল? এ ব্যাপারে বিশুদ্ধভাবে কিছু বর্ণিত হয়নি। তবে এটা প্রসিদ্ধ আছে যে, (দুনিয়ার) প্রাথমিক অবস্থায় আদম ও হাওয়া (আলাইহিমাস সালাম)এর মিলনের ফলে একই সময় (যমজ) একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করত। দ্বিতীয় গর্ভেও অনুরূপ একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করত। তখন একটি গর্ভের ছেলে-মেয়ের সাথে আর একটি গর্ভের ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত। হাবীলের যমজ বোন সুন্দরী ছিল না। কিন্তু ক্বাবীলের যমজ বোনটি সুন্দরী ছিল। আর তখনকার রীতি-নীতি অনুসারে হাবীলের বিবাহ ক্বাবীলের যমজ বোনের সাথে আর ক্বাবীলের বিবাহ হাবীলের যমজ বোনের সাথে হওয়ার কথা। কিন্তু ক্বাবীল হাবীলের বোনের পরিবর্তে নিজের যমজ বোনকে বিবাহ করতে চাইল; কারণ সে সুন্দরী ছিল। তখন আদম ﷺ ক্বাবীলকে বুঝালেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বুঝল না। পরিশেষে আদম ﷺ উভয়কেই আল্লাহর নামে কুরবানী পেশ করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন যে, যার কুরবানী কবুল হবে, ক্বাবীলের যমজ বোনের সাথে তার বিবাহ দিয়ে দেওয়া হবে। কুরবানী পেশ করা হলে হাবীলের কুরবানী কবুল হল; অর্থাৎ আসমান থেকে আগুন এসে (হাবীলের) কুরবানীকে জ্বালিয়ে ফেলল; যা ছিল (সে যুগের) কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন। কিছু মুফাসসিরগণের মতে তারা উভয়েই নিজ নিজ নযর আল্লাহর দরবারে পেশ করল। হাবীল একটি মোটাতাজা দুম্বা বা মেষ কুরবানী করল। আর ক্বাবীল গমের কিছু শিষ কুরবানীর জন্য পেশ করল। ফলে হাবীলের কুরবানী কবুল হল। আর তা দেখে ক্বাবীল হিংসায় ফেটে পড়ল।

([১০৫]) আমার গোনাহ বা পাপের অর্থ হ'ল, দুজনে লড়াই করার সময় যদি তোমাকে আমার হত্যা করার উদ্দেশ্য থাকে। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামে যাবে। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ﷺগণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, হত্যাকারী জাহান্নামে যাবে --এটা তো তার উপযুক্ত শাস্তি; কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন জাহান্নামে যাবে? প্রত্যুত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন; এই জন্য যে, সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। (বুখারী ও মুসলিম ঃ ফিতান অধ্যায়)

([১০৬]) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তার খুনের বোঝা আদম ﷺ-এর ঐ প্রথম সন্তানের উপরেই পতিত হয়। কেননা সে-ই সর্বপ্রথম ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে রক্ত বইয়েছিল।" (বুখারী ও মুসলিম) প্রকাশ থাকে যে, হাবীলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার শাস্তি ক্বাবীলকে ততক্ষণাৎ দুনিয়াতেই দেওয়া হয়েছে। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যতগুলো পাপ এরই উপযুক্ত যে, আল্লাহ সত্বর তার শাস্তি দুনিয়াতেই প্রদান করবেন এবং পরকালেও তার জন্য ভীষণ শাস্তি জমা রাখবেন, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে, যুলুম ও সীমালঙ্ঘন করা এবং আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক ছেদন করা।" আর ক্বাবীলের মধ্যে এ দু'টো পাপই জমা হয়েছিল। ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিউন। (ইবনে কাসীর)

([১০৭]) এই অন্যায়ভাবে হত্যার পর, মানুষের প্রাণের মূল্য যে কত বেশী ও তার মর্যাদা যে কত বড়, তা পরিষ্কারভাবে আল্লাহ বানী ইস্রাঈলের উপরে এই নির্দেশ অবতীর্ণ ক'রে বলে দিয়েছেন। যার দ্বারা এই অনুমান করা যায় যে, আল্লাহর নিকট মানুষের রক্তের গুরুত্ব ও মর্যাদা কত! আর এই নীতি শুধু বানী ইস্রাঈলদের জন্য ছিল না; বরং ইসলামী মূলনীতি মোতাবেক এই নীতি

أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ(٣٢)

আমার রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল, কিন্তু এর পরও অনেকে পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই রয়ে গেল।[১০৮]

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)

(৩৩) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে (অশান্তি সৃষ্টি ক'রে বেড়ায়) তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে।[১০৯] ইহকালে এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)

(৩৪) তবে তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসার পূর্বে যারা তওবা করবে (তাদের জন্য) জেনে রাখ যে, আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১১০]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

(৩৫) হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর[১১১] ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা

চিরস্থায়ী সকলের জন্য। সুলাইমান বিন রাবী' বলেন, আমি হাসান বাসরী (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'বানী ইস্রাঈল যেমন এ হুকুমের আওতাভুক্ত ছিল, তেমনি আমরাও কি এই আয়াতের হুকুমের আওতাভুক্ত?' তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! বানী ইস্রাঈলের রক্ত আল্লাহর নিকট আমাদের রক্ত অপেক্ষা কোনক্রমেই অধিক মর্যাদাপূর্ণ নয়।' (তাফসীর ইবনে কাসীর)

(১০৮) আয়াতের এই অংশে ইয়াহুদীদেরকে ভীতি-প্রদর্শন ও তিরস্কার করা হয়েছে। কেননা তাদের নিকট আল্লাহ প্রেরিত নবীগণ সুস্পষ্ট দলীল ও অকাট্য প্রমাণ নিয়ে আগমন করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের নীতিই হচ্ছে সব সময় সীমালঙ্ঘন ও বিরুদ্ধাচরণ করা। সম্ভবতঃ নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই এখানে তাদের কুকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমাকে তারা হত্যা করার পরিকল্পনা এবং ক্ষতিসাধন করার যে চক্রান্ত করছে, এটা কোন নতুন কথা নয়। বরং তাদের সমস্ত জীবনটাই ষড়যন্ত্র ও ফিতনাবাজীতে পরিপূর্ণ। সুতরাং তুমি আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা রাখ। তিনিই হচ্ছেন সূক্ষ্ম শ্রেষ্ঠতম কৌশলী। সমস্ত চক্রান্ত হতে তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল অবলম্বনকারী।

(১০৯) উক্ত আয়াত অবতীর্ণের কারণ এই যে, উক্‌ল বা উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় আগমন করে এবং মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হয়। অতঃপর নবী ﷺ তাদেরকে মদীনার বাহিরে যেখানে সাদক্বাহর উট ছিল সেখানে পাঠিয়ে দেন, সেখানে তারা উটের প্রস্রাব ও দুধ পান করবে, তাতে আল্লাহ আরোগ্যদান করবেন। সুতরাং কিছু দিনের মধ্যেই তাদের অসুখ ভালো হয়ে গেল। কিন্তু তারপর তারা উটের রাখালকে মেরে ফেললো এবং উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেল। যখন রসূল ﷺ-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-কে তাদের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে তাদেরকে উট সহ ধরে আনার নির্দেশ দিলেন। (অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও ক'রে রসূল ﷺ-এর সামনে পেশ করা হল।) নবী ﷺ তাদের হাত-পা কেটে ফেলা এবং চোখে গরম শলাকা ফিরানোর নির্দেশ দিলেন। (কেননা তারাও রাখালদের সাথে অনুরূপ আচরণ করেছিল।) অতঃপর তাদেরকে রৌদ্রে রাখা হল, ফলে তারা ধড়ফড় ক'রে মৃত্যুবরণ করল। সহীহ বুখারীতে এই শব্দ সহ বর্ণিত হয়েছে যে, তারা চুরিও করেছিল, হত্যাও করেছিল, ঈমান আনার পর কুফরীও করেছিল, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিল।

(১১০) অর্থাৎ যে ব্যক্তি গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তওবা করে ইসলামী শাসনের আনুগত্যের কথা ঘোষণা করবে, তাকে ক্ষমা ক'রে দেওয়া হবে আর ইসলামী দণ্ড-বিধি তার উপর প্রয়োগ করা হবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও উলামাগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে, যেমন কোন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল অথবা ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করল অথবা কারো মান-ইজ্জত হরণ করল, তাহলে কি এই অপরাধগুলি ক্ষমা হয়ে যাবে, অথবা তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে? কোন কোন উলামার উক্তি হচ্ছে ,ক্ষমা হবে না; বরং প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। ইমাম শাওকানী (রঃ) ও ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) গণের উক্তি হচ্ছে, আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা এটা জানা যাচ্ছে যে, সমস্ত শাস্তিই তার উপর থেকে উঠে যাবে। কিন্তু হ্যাঁ ! যদি গ্রেফতার হওয়ার পর তওবা করে, তাহলে তার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হবে না; বরং সে শাস্তির উপযুক্তই থাকবে। (ফাতহুল ক্বাদীর, ইবনে কাসীর)

(১১১) অসীলাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে, ঐ জিনিস যার মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করা যায় অথবা কোন বস্তুর নিকটবর্তী হওয়া যায়। 'আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর' এর ভাবার্থ হচ্ছে; এমন কর্ম সম্পাদন করা, যার দ্বারা তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য অর্জন করতে পার। ইমাম শাওকানী (রঃ) বলেন; অসীলা শব্দটি নৈকট্য লাভের অর্থ বুঝায়, তা ছাড়া সংযম (তাক্বওয়া) ও অন্যান্য ভালো কর্মের সাথে সম্পৃক্ত যার দ্বারা বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। অনুরূপভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম কর্ম করা থেকে বিরত থাকার দ্বারাও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়। কেননা নিষিদ্ধ ও হারাম কর্ম বর্জন করাও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। কিন্তু অজ্ঞরা প্রকৃত অসীলাকে বাদ দিয়ে কবরে সমাধিস্থ মানুষদেরকে নিজেদের অসীলা বানিয়ে নিয়েছে; যার শরীয়তে কোন ভিত্তি নেই। অনুরূপ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতের সুউচ্চ স্থানকেও 'অসীলা' বলা হয়;

সফলকাম হতে পার।

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣٥)

(৩৬) যারা অবিশ্বাস করেছে পৃথিবীতে যা কিছু আছে, যদি তাদের তার সমস্ত থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো থাকে এবং কিয়ামতের দিন শাস্তি হতে মুক্তির জন্য পণস্বরূপ তা দিতে চায়, তবুও তাদের নিকট হতে তা গৃহীত হবে না এবং তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি বর্তমান।[১১২]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣٦)

(৩৭) তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা তা থেকে বের হতেই পারবে না এবং তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রয়েছে।[১১৩]

يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٣٧)

(৩৮) চোর এবং চোরনীর হাত কেটে ফেলো,[১১৪] এ তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর তরফ হতে শাস্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

(৩৯) কিন্তু কেউ পাপ করার পর তওবা করলে এবং (নিজেকে) সংশোধন করলে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন।[১১৫] নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩)

(৪০) তুমি কি জান না যে, আকাশ ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই, যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤٠)

(৪১) হে রসূল! যারা মুখে বলে, 'বিশ্বাস করেছি' কিন্তু অন্তরে বিশ্বাসী নয় ও যারা ইয়াহুদী হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসে তৎপর, তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়।[১১৬] ওরা মিথ্যা শ্রবণে (ও অনুসরণে) অত্যন্ত আগ্রহশীল, যে সম্প্রদায় তোমার নিকট আসেনি, ওরা তাদের জন্য (তোমার কথায়) কান পেতে (গোয়েন্দাগিরি ক'রে) থাকে। (তাওরাতের) বাক্যগুলিকে

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ

যা নবী ﷺ-কে প্রদান করা হবে। আর এই জন্যেই নবী ﷺ বলেছেন; যে ব্যক্তি আযানের পর এই দুআ পাঠ করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ হালাল হয়ে যাবে। (বুখারী ঃ আযান অধ্যায় ও মুসলিম ঃ নামায অধ্যায়) অসীলার দুআ যা আযানের পর পঠনীয়, তা হচ্ছে; "আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা'অতিত্ তা-ম্মাহ, অসস্বালা-তিল ক্বা-য়িমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অলফাযীলাহ, অবআসহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী অআত্তাহ।"

(১১২) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহান্নামের একটি লোককে জাহান্নাম থেকে বের ক'রে আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে। তারপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুমি তোমার বাসস্থান কেমন পেয়েছ?' সে উত্তরে বলবে; 'অত্যন্ত খারাপ জায়গা।' তারপর আল্লাহ আবার বলবেন, 'তুমি কি এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ প্রদানে সম্মত আছ?' সে উত্তরে বলবে, 'হ্যাঁ।' তারপর আল্লাহ বলবেন, 'আমি তো তোমার নিকট পৃথিবীতে এর চেয়েও বহু কম চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি সেটাও দাওনি বা পরোয়া করনি।' অতঃপর পুনরায় তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম, কিয়ামত অধ্যায় ও বুখারী রিক্বাক ও আম্বিয়া অধ্যায়)

(১১৩) উক্ত আয়াতটি কাফেরদের জন্যই, কেননা মুমিনগণকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগের পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে, যেমন; বহু হাদীস থেকে প্রমাণিত।

(১১৪) কতক যাহেরিয়া মযহাবের ফিক্হবিদদের অভিমত এই যে, চুরির এই বিধান সকল প্রকার চুরির জন্য ব্যাপক; চাহে তা অল্পই হোক, আর বেশীই হোক এবং সুরক্ষিত জায়গা থেকে চুরি করা হোক অথবা অরক্ষিত জায়গা থেকে চুরি করা হোক, সর্বাবস্থাতেই চোরের হাত কাটা যাবে। অথচ অন্যান্য ফিক্হবিদদের অভিমত এই যে, তা সুরক্ষিত জায়গা থেকে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল চুরির শর্ত আছে। পরন্তু সেই নির্দিষ্ট পরিমাণের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের অভিমত এই যে, এক চতুর্থাংশ স্বর্ণমুদ্রা (দীনার) অথবা তিনটি রৌপ্যমুদ্রা (দিরহাম) অথবা ঐ পরিমাণ মূল্যের কোন জিনিস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে; অন্যথা এর থেকে কম পরিমাণ হলে হাত কাটা যাবে না। অনুরূপভাবে হাত কবজি পর্যন্ত কাটা হবে; কনুই বা কাঁধ পর্যন্ত নয়, যেমন অনেকের অভিমত। (বিস্তারিত জানার জন্য বিভিন্ন হাদীস, ফিক্হ ও তফসীর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

(১১৫) এখানে তাওবার উদ্দেশ্য হচ্ছে; এমন তওবা যা আল্লাহ কবুল করেন। এটা নয় যে, তওবার ফলে চুরি অথবা অন্য কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। যেহেতু শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ড তওবার ফলে মাফ হয় না।

(১১৬) কাফের ও মুশরিকদের ঈমান গ্রহণ না করা এবং সঠিক পথ অবলম্বন না করার ফলে নবী ﷺ যে অস্থিরতা ও আক্ষেপের শিকার হয়েছিলেন, তার জন্য আল্লাহ নিজ নবীকে অধিক চিন্তা না করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে এ ব্যাপারে তিনি সান্ত্বনা পান যে এই লোকদের ব্যাপারে তিনি আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হবেন না।

يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدْ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللهِ شَيْئاً أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدْ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(٤١)

ওর স্বস্থান হতে পরিবর্তন করে। তারা বলে, 'এ প্রকার (বিকৃত বিধান) দিলে গ্রহণ কর এবং এ (বিকৃত বিধান) না দিলে বর্জন কর।'[১১৭] আর আল্লাহ যার পথচ্যুতি চান, তার জন্য আল্লাহর নিকট তোমার কিছুই করার নেই। ঐ সকল লোকের হৃদয়কে আল্লাহ বিশুদ্ধ করতে চান না। তাদের জন্য আছে ইহকালে লাঞ্ছনা ও পরকালে মহাশাস্তি।

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢)

(৪২) তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল[১১৮] এবং অবৈধ উপায়ে লব্ধ বস্তু ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত, তারা যদি তোমার নিকট আসে, তাহলে তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর অথবা তাদেরকে উপেক্ষা কর। আর যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাহলে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি বিচার-নিষ্পত্তি কর, তাহলে ন্যায়পরায়ণতার সাথে কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (٤٣)

(৪৩) আর তারা তোমার উপর কিরূপে বিচার-ভার ন্যস্ত করছে, যখন তাদের নিকট রয়েছে তওরাত; যাতে আছে আল্লাহর আদেশ? এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওরা আসলে বিশ্বাসীই নয়।

---

(১১৭) ৪১ থেকে ৪৪নং আয়াতগুলির অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়; (ক) বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী ইয়াহুদীর ঘটনা। এমনিতে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের মধ্যে বহু পরিবর্তন সাধন করেছিল, তার উপর তার অনেক বিধান অনুযায়ী আমল করত না। তার মধ্যে (একটি বিধান) রজম বা পাথর নিক্ষেপ ক'রে হত্যা করার দণ্ডবিধান; যা তাদের গ্রন্থে বিবাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষের জন্য বিদ্যমান ছিল এবং যা আজও বিদ্যমান আছে। সুতরাং যেহেতু তারা এই শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে চাচ্ছিল, সেহেতু তারা আপোসে সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল যে, 'চল, আমরা মুহাম্মাদের নিকট যাই। তিনি যদি আমাদের মনগড়া শাস্তি দানের মতই চাবুক মেরে লাঞ্ছিত করার শাস্তির নির্দেশ দেন, তাহলে আমরা তা মান্য ক'রে নেব। অন্যথা তিনি যদি রজম বা পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেন, তাহলে আমরা তা মান্য করব না।' আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেন; ইয়াহুদীগণ রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের তাওরাতে রজমের ব্যাপারে কি নির্দেশ রয়েছে?' তারা বলল, 'তাওরাতে ব্যভিচারের শাস্তি হিসাবে তাকে চাবুক মারা ও লাঞ্ছিত করার কথা উল্লেখ আছে।' (এ কথা শুনে) আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﷺ বললেন, 'তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাতে পাথর ছুঁড়ে হত্যার নির্দেশ রয়েছে। যাও, তাওরাত নিয়ে এসো দেখি!' তারা তাওরাত নিয়ে এসে পড়তে শুরু করল বটে; কিন্তু রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে দিয়ে পূর্বাপর সমস্ত পড়ে শুনালো। আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﷺ বললেন, 'হাত সরিয়ে নাও!' হাত সরালে দেখা গেল যে, সেখানে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তখন তাদেরকেও স্বীকার করতেই হল যে, মুহাম্মাদ ﷺ সত্যই বলছেন, তাওরাতে রজমের আয়াত আছে। (অতঃপর রসূল ﷺ-এর নির্দেশক্রমে) ব্যভিচারীদ্বয়কে পাথর নিক্ষেপ ক'রে হত্যা ক'রে দেওয়া হল। *(বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ দ্রষ্টব্য)* (খ) একটি অন্য ঘটনাও বর্ণনা করা হয় যে, ইয়াহুদীদের একটি গোত্র অন্য গোত্র অপেক্ষা বেশী সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন মনে করত। আর এই কারণেই নিজেদের লোক খুন হলে অপর গোত্রের নিকট হতে একশ' অসাক রক্তপণ দাবী করত। পক্ষান্তরে অন্য গোত্রের কেউ খুন হলে পঞ্চাশ অসাক রক্তপণ নির্ধারিত করত। যখন নবী ﷺ মদীনায় আগমন করলেন, তখন ইয়াহুদীদের দ্বিতীয় দল যাদের রক্তপণ অর্ধেক ছিল তারা উৎসাহ পেল। (অর্থাৎ তারা ভাবল যে, এবার আমরা ন্যায় বিচার পাব।) এবং তারা একশ' অসাক রক্তপণ দিতে অস্বীকার করল। আর এ নিয়ে তাদের মধ্যে লড়াই শুরু হওয়ার উপক্রম ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক রসূল ﷺ-এর নিকট বিচার প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলে ঐ সময় এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। যার মধ্যে একটি আয়াতে রক্তপণের বিধান সকলের জন্য সমান বলা হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ ১/২৪৬, আহমাদ শাকের হাদীসটির সূত্রকে সহীহ বলেছেন।) ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, সম্ভবতঃ উভয় ঘটনাই একই সময়ের এবং উক্ত সকল কারণের জন্যই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

(১১৮) سماعون শব্দের অর্থ হচ্ছে; অধিক শ্রবণকারী। আর এ কারণেই এর দুটি অর্থ হতে পারে (ক) গোয়েন্দাগিরি বা গুপ্তচরবৃত্তির জন্য শ্রবণ করা অথবা (খ) অন্যের কথা মান্য ও গ্রহণ করার জন্য শ্রবণ করা। কেউ কেউ প্রথম অর্থটি গ্রহণ করেছেন, আবার কেউ দ্বিতীয় অর্থটি।

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (٤٤)

(৪৪) নিশ্চয় আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, ওতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো। আল্লাহর অনুগত নবীগণ,[১১৯] রাব্বানী (আল্লাহ-ভক্ত)গণ এবং পন্ডিতগণও ইয়াহুদীদেরকে[১২০] তদনুসারে বিধান দিত, কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল[১২১] এবং তারা ছিল ওর (সত্যতার) সাক্ষী।[১২২] সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না।[১২৩] আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অবিশ্বাসী (কাফের)।[১২৪]

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (٤٥)

(৪৫) আর তাদের জন্য ওতে (তওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাণ, চোখের বদল চোখ, নাকের বদল নাক, কানের বদল কান, দাঁতের বদল দাঁত এবং জখমের বদল অনুরূপ জখম।[১২৫] অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে ওতে তারই পাপ মোচন হবে। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অত্যাচারী।[১২৬]

---

(১১৯) أسلموا ক্রিয়াপদটি نبيين এর বিশেষণ। অর্থাৎ, মুসলিম বা আল্লাহর অনুগত নবীগণ। যেহেতু সমস্ত নবীগণই ইসলাম ধর্মেরই অনুসারী ছিলেন, যার দিকে মুহাম্মাদ ﷺ দাওয়াত দিচ্ছেন। অর্থাৎ, সমস্ত নবীগণের দ্বীন বা ধর্ম এক ও অভিন্ন। আর ইসলামী দাওয়াতের মূল ভিত্তি হলো (তাওহীদ); অর্থাৎ, একমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে আর তাঁর ইবাদতের সাথে অন্য কাউকে শরীক বা অংশীদার করা যাবে না। আর প্রত্যেক নবীই স্ব স্ব গোত্রকে সর্বপ্রথম তাওহীদের এই একনিষ্ঠ বাণীই পেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন; {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} অর্থাৎ, আমি তোমার পূর্বে 'আমি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই; সুতরাং তোমরা আমারই উপাসনা কর'-এ প্রত্যাদেশ ছাড়া কোন রসুল প্রেরণ করিনি। (সূরা আম্বিয়া ২৫) আর কুরআনে একে দ্বীনও বলা হয়েছে, যেমন সূরা শু'রার ১৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا} যাতে ঐ একই বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমার জন্য আমি ঐ জীবন-বিধানই নির্ধারিত করেছি যা তোমার পূর্বে নবীগণের উপর নির্ধারিত করেছিলাম।

(১২০) للذين هادوا এর সম্পর্ক يحكم ক্রিয়াটির সাথে। অর্থাৎ ইয়াহুদীদের ব্যাপারেও ফায়সালা করতেন।

(১২১) সুতরাং তাঁরা তাওরাতের মধ্যে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেননি, যেমনটি তাঁদের পরবর্তী লোকেরা করেছিল।

(১২২) এই যে, এ গ্রন্থ অর্থাৎ কুরআন কারীম পরিবর্ধন ও হ্রাস থেকে সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহর নিকট থেকে (সর্বশেষ) অবতীর্ণ গ্রন্থ।

(১২৩) অর্থাৎ, লোকের ভয়ে ভীত হয়ে তাওরাতের আসল বিধান গোপন করো না এবং পার্থিব সামান্য সম্পদ লাভের জন্য তাতে কোন প্রকার রদবদল করো না।

(১২৪) সুতরাং কিভাবে তোমরা ঈমানের পরিবর্তে কুফরীর উপর সন্তুষ্ট রয়ে গেলে?

(১২৫) যখন তাওরাতে জানের বদলে জান এবং ক্ষতের ব্যাপারে ক্বিসাসের বিধান ছিল; তখন ইয়াহুদীদের এক গোত্র (বানু নাযীর)এর অন্য গোত্র (বানু কুরায়যাহ)এর সাথে তার বিপরীত আচরণ করা এবং স্বগোত্রীয় লোকের রক্তপণ অপর গোত্রের লোকের দ্বিগুণ নেওয়ার বৈধতা কোথায়? যেমন এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে হয়েছে।

(১২৬) এ আয়াত ইঙ্গিত করে যে, যে গোত্র আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত ফায়সালা করেছিল তারা যুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়েছিল। আসলে মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করে, সেই মোতাবেক বিচার-ফায়সালা করে এবং নিজেদের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডে ঐ বিধান থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করে। আর যদি তারা তা না করে, তাহলে আল্লাহর দরবারে তারা যালেম (অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারী), ফাসেক (পাপী) ও কাফের বিবেচিত হবে। আর এই ধরনের লোকেদের জন্য আল্লাহ তিন রকম শব্দ ব্যবহার করে নিজের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কথা পূর্ণরূপে ব্যক্ত ক'রে দিয়েছেন। এর পরেও যদি মানুষ নিজেদের জীবনে নিজস্ব মনগড়া বিধান এবং নিজেদের ইচ্ছা ও খেয়ালখুশীকে অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে এর থেকে বেশী দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে ?

নোট ঃ- উসূল (ফিক্বহী মৌলনীতির) উলামাগণ লিখেছেন যে, বিগত শরীয়তের বিধান যদি আল্লাহ অব্যাহত রাখেন, তাহলে তার উপর আমল করা আমাদের জন্যও জরুরী। আর উক্ত আয়াতের বিধান রহিত হয়নি। সুতরাং এটাই ইসলামী শরীয়তের একটা বিধান, যা হাদীস থেকেও প্রমাণিত। অনুরূপভাবে হাদীস দ্বারা أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ জানের বদলে জানের ব্যাপক বিধান থেকে দুটি অবস্থা বহির্ভূত। (ক) যদি কোন মুসলিম কোন কাফেরকে হত্যা ক'রে ফেলে, তাহলে কাফেরের পরিবর্তে মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না। (খ) অনুরূপভাবে কোন স্বাধীন ব্যক্তি যদি কোন ক্রীতদাসকে হত্যা ক'রে ফেলে, তাহলে তাকে তার পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না। (বিস্তারিত দেখুন ঃ ফাতহুল বারী, নায়নুল আওতার ইত্যাদি)

وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٤٦)

(৪৬) আমি তাদের (নবীগণের) পরে পরেই মারয়্যাম-তনয় ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরূপে প্রেরণ করেছিলাম[১২৭] এবং সাবধানীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাকে ইঞ্জীল (ঐশীগ্রন্থ) দিয়েছিলাম, ওতে ছিল পথ-নির্দেশ ও আলো।[১২৮]

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (٤٧)

(৪৭) ইঞ্জীল-ওয়ালাদের উচিত, আল্লাহ ওতে (ইঞ্জীলে) যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে বিধান দেওয়া।[১২৯] আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে বিধান দেয় না, তারাই পাপাচারী।

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

(৪৮) এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে[১৩০] আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে তুমি তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর[১৩১] এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে, তা ত্যাগ ক'রে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।[১৩২] তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি শরীয়ত (আইন) ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি।[১৩৩] ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে

([১২৭]) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নবীগণের পর পরই ঈসা ﷺ-কে (আল্লাহ রসূল রূপে) তাওরাতের সত্যায়ন করার জন্য প্রেরণ করেন, মিথ্যায়ন করার জন্য নয়। যা এই কথাই প্রমাণ করে যে, ঈসা ﷺও সত্য রসূল ছিলেন এবং ঐ আল্লাহরই প্রেরিত ছিলেন, যিনি মূসা ﷺ-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও ইয়াহুদীরা ঈসা ﷺ-কে মিথ্যাবাদী মনে করে; এমনকি তাঁকে কাফের মনে করে, তাঁকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করে!

([১২৮]) অর্থাৎ, যেমন তাওরাত তার সময়ের লোকদের জন্য পথ প্রদর্শকরূপে ছিল অনুরূপভাবে ইঞ্জীল অবতীর্ণ হওয়ার পর সেই মর্যাদার অধিকারী ইঞ্জীল হয়ে যায় এবং তারপর কুরআন অবতীর্ণ হলে তাওরাত ইঞ্জীল ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের বিধান রহিত হয়ে যায় এবং হিদায়াত ও মুক্তির পথ নির্দেশনা রূপে শুধুমাত্র কুরআন কারীম বিদ্যমান থাকে। আর এর পরই মহান আল্লাহ আসমানী গ্রন্থের ধারাবাহিকতা বন্ধ ক'রে দেন। সুতরাং এ যেন এ কথারই ঘোষণা যে, কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি শুধুমাত্র কুরআনের অনুসরণেই বিদ্যমান। যে এ গ্রন্থের সাথে সম্পর্ক রাখে, সে সফলকাম ও বিজয়ী হবে। আর যে এর সাথে সম্পর্ক ছেদন করে, সে অকৃতকার্য ও হতভাগায় পরিণত হবে। অতএব বুঝা গেল যে, 'সব ধর্ম সমান'-এর দর্শন নিতান্তই ভুল। কেননা হক (সত্য) সমস্ত যুগে একটাই হয়; একাধিক নয়। আর হক ব্যতীত সবই বাতিল (ভ্রষ্ট)। তাওরাত তার যুগে সঠিক বা হক ছিল এবং তারপর ইঞ্জীলও তার যুগে সঠিক ও হক ছিল। ইঞ্জীল অবতীর্ণ হওয়ার পর তাওরাতের উপর আমল বৈধ ছিল না। অতঃপর যখন কুরআন অবতীর্ণ হল, তখন ইঞ্জীল রহিত হয়ে গেল; তার উপর আমল করা বৈধ নয়। বলা বাহুল্য, একমাত্র বিধান ও (ইহ-পরকালে) মানুষের মুক্তির উপায় কুরআনই। কুরআনের উপর ঈমান ও আমল ব্যতীত মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। (বিস্তারিত সূরা বাক্বারার ৬২ নম্বর আয়াতের টীকায় দেখুন।)

([১২৯]) ঈসা ﷺ-এর নবুঅত কালে আহলে ইঞ্জীলদেরকে এই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুঅত প্রাপ্তির পর ঈসা ﷺ-এর নবুঅতের যুগ শেষ হয়ে যায়; অনুরূপ ইঞ্জীলের অনুসরণের নির্দেশও। বর্তমানে ঐ ব্যক্তি ঈমানদার বা মু'মিন বলে বিবেচিত হবে, যে মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতের উপর ঈমান আনবে এবং কুরআনের অনুসরণ করবে।

([১৩০]) প্রত্যেক আসমানী গ্রন্থ তার পূর্বোক্ত গ্রন্থের সত্যায়ন করে। অনুরূপ কুরআনও পূর্বোক্ত সমস্ত (আসমানী) গ্রন্থের সত্যায়ন করে। আর সত্যায়নের অর্থ হচ্ছে; সমস্ত গ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কুরআন সত্যের সাক্ষ্যপ্রদানকারী হওয়ার সাথে সাথে সংরক্ষক, বিশ্বস্ত ও প্রভাবশালী গ্রন্থ। অর্থাৎ পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে; কিন্তু কুরআন এ থেকে সুরক্ষিত আছে। আর এই জন্যই কুরআনের ফায়সালাই সত্য বিবেচিত হবে; কুরআন যাকে সঠিক বলে বিবেচনা করবে, সেটাই সঠিক হিসাবে গণ্য হবে। আর বাকী সবই বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

([১৩১]) ইতিপূর্বে ৪২নং আয়াতে নবী ﷺ-কে এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছিল যে, তুমি ওদের ব্যাপারে বিচার-ফায়সালা কর অথবা না কর, সেটা তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর। কিন্তু এখন সে ক্ষেত্রে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের ব্যাপারে তুমি কুরআনের বিধান মোতাবেক ফায়সালা প্রদান কর।

([১৩২]) এখানে আসলে উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবগত করানো হচ্ছে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত গ্রন্থ হতে বিমুখ হয়ে মানুষের খেয়াল-খুশী এবং মনগড়া মতবাদ ও আইন-কানুন অনুযায়ী ফায়সালা করা ভ্রষ্টতা। যার অনুমতি নবী ﷺ-কে প্রদান করা হয়নি, তাহলে অন্যরা কি ক'রে এ কর্ম সম্পাদন করতে পারে ?

([১৩৩]) এর অর্থ হলো; পূর্বোক্ত শরীয়তসমূহ, যার মধ্যে গৌণ বিষয়ে (আংশিক) কিছু একে অপর থেকে পার্থক্য ছিল। এক শরীয়তে কোন জিনিস বৈধ (হালাল) ছিল; কিন্তু অন্য শরীয়তে তা অবৈধ (হারাম) ছিল। কোন শরীয়তে কোন বিষয় বড় কষ্টকর ছিল, পক্ষান্তরে অন্য শরীয়তে তা সহজ ছিল। কিন্তু দ্বীন সকলের একই ছিল। অর্থাৎ, তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর

وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٨)

পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য (তিনি তা করেননি)।[১৩৪] অতএব সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর, আল্লাহর দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩)

(৪৯) এবং (পুনঃ বলছি) আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তুমি তদনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি কর এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। আর এ সম্বন্ধে সতর্ক থাক, যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, ওরা তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠)

(৫০) তবে কি তারা প্রাগ-ইসলামী (জাহেলী) যুগের বিচার-ব্যবস্থা পেতে চায়?[১৩৫] খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?[১৩৬]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١)

(৫১) হে বিশ্বাসিগণ! ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।[১৩৭] তারা একে অপরের বন্ধু।[১৩৮] তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।[১৩৯]

এই কারণেই সকলের দাওয়াতও এক ও অভিন্ন ছিল। এ বিষয়টি হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, "আমরা নবীগণ বৈমাত্রেয় ভাই ভাই; আমাদের সকলের দীন অভিন্ন।" বৈমাত্রেয় ভাই বলা হয়; যাদের বাপ এক; কিন্তু মা ভিন্ন ভিন্ন। অর্থ হল, দ্বীন সকলের এক (তাওহীদ) ছিল; কিন্তু আইন ও পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য ছিল। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়ত রহিত হয়ে যায়। সুতরাং এখন শুধু একটাই দ্বীন ও একটাই শরীয়ত (যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য মান্য ও অপরিহার্য)।

(১৩৪) অর্থাৎ, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর মুক্তির পথ তো শুধুমাত্র কুরআনেই আছে। কিন্তু এই মুক্তির পথ অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ মানুষকে বাধ্য করেননি; অথচ তিনি ইচ্ছা করলে তা করতে পারতেন। কেননা তাতে পরীক্ষা করা সম্ভব ছিল না, অথচ তিনি মানুষকে পরীক্ষা করতে চান।

(১৩৫) কুরআন ও ইসলাম ব্যতীত সবই জাহেলিয়াত বা অন্ধকার। এরা কি ইসলামের আলো ও হিদায়াতকে ছেড়ে এখনও জাহেলিয়াত অনুসন্ধান করে? এখানে প্রশ্ন অস্বীকৃতি এবং ধমকের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর (ف) অব্যয়টি একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংযোজকরূপে ব্যবহার হয়েছে; আসলে বাক্য হচ্ছে; أيعرضون عن حكمك بما أنزل الله عليك ويتولون عنه ويبتغون حكم الجاهلية অর্থাৎ, আল্লাহ তোমার উপর যা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা তোমার বিচার হতে তারা কি বিমুখ হতে চায় এবং পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে, আর জাহেলী যুগের বিচার-পদ্ধতি অনুসন্ধান করে? *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

(১৩৬) হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন; তিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী অপছন্দনীয়; যে (মক্কার) হারামে পাপাচার করে, যে ইসলামে জাহেলী (অজ্ঞতা) যুগের চাল-চলন ও নিয়ম-কানুন অনুসন্ধান করে এবং যে অকারণে কারো নিকট থেকে খুনের দাবী করে। (বুখারী, দিয়াত অধ্যায়)

(১৩৭) এখানে ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তারা ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, তারা তদেরই দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। (বিস্তারিত দেখুন, সূরা আলে-ইমরানের ২৮ ও ১১৮নং আয়াতের টীকা)

(১৩৮) প্রত্যেক মানুষ কুরআনে বর্ণিত এই প্রকৃতত্বকে লক্ষ্য করতে পারে যে, ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানরা তাদের পরস্পরের মধ্যে আকীদাগত কঠিন মতভেদ এবং পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা বিদ্যমান আছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা একে অপরের পৃষ্ঠপোষক ও সহায়ক।

(১৩৯) এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয় যে, উবাদা বিন স্বামেত আনসারী ﷺ এবং মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই দু'জনেই জাহেলিয়াতের যুগ থেকে ইয়াহুদীদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। বদরের যুদ্ধে যখন মুসলিমগণ বিজয়ী হলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নিজেকে মুসলিম বলে প্রকাশ করল। এদিকে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বানু কাইনুকার ইয়াহুদীরা ফিতনার আগুন জ্বালিয়ে দিল এবং তা নির্বাপিত করা হল। এর ফলে উবাদা ﷺ ইয়াহুদীদের সাথে মৈত্রী-সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা ক'রে দিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিপরীত পথ অবলম্বন ক'রে ইয়াহুদীদেরকে বাঁচানোর জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা শুরু ক'রে দিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (٥٢)

(৫২) যাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রয়েছে[১৪০] তুমি তাদেরকে সত্বর এ বলে তাদের সাথে মিলিত হতে দেখবে যে, আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটবে।[১৪১] হয়তো আল্লাহ বিজয়[১৪২] অথবা তাঁর নিকট হতে এমন কিছু দেবেন[১৪৩] যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল তার জন্য অনুতপ্ত হবে।

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (٥٣)

(৫৩) এবং বিশ্বাসিগণ বলবে, এরাই কি তারা, যারা আল্লাহর নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করে বলেছিল যে, 'তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে?' তাদের কাজ নিষ্ফল হয়েছে ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٥٤)

(৫৪) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে[১৪৪] আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে,[১৪৫] তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না,[১৪৬] এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (٥٥)

(৫৫) নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল ও বিশ্বাসিগণ;[১৪৭] যারা বিনত হয়ে নামায পড়ে ও যাকাত আদায় করে।

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ

(৫৬) আর যে কেউ আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, (সে হবে আল্লাহর দলভুক্ত।) নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।[১৪৮]

---

(১৪০) উদ্দেশ্য মুনাফেকী বা কপটতা রয়েছে। অর্থাৎ মুনাফিকরা ইয়াহুদীদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে তড়িঘড়ি করে।

(১৪১) অর্থাৎ, মুসলিমরা পরাজিত হলে তার ফলে হয়তো আমাদেরকেও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু যদি ইয়াহুদীদের সাথে মিত্রতা-বন্ধুত্ব থাকে, তাহলে সেই সময়ে আমাদের বড়ই উপকার হবে।

(১৪২) অর্থাৎ, মুসলমানদেরকে।

(১৪৩) ইয়াহুদ ও নাসারাদের উপর জিযিয়া-কর নির্ধারণ করবেন। এ আয়াত বানু কুরাইযাকে হত্যা ও তাদের সন্তানদেরকে বন্দী এবং বানু নাযীরকে নির্বাসিত করার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে; যা তা অদূর ভবিষ্যতেই সংঘটিত হয়েছিল।

(১৪৪) আল্লাহ তাআলা নিজের ইল্‌ম মোতাবেক বলেছেন; যা নবী করীম ﷺ-এর মৃত্যুর পরপরই প্রকাশ পেয়েছিল। তা হচ্ছে, ইসলাম-ত্যাগের ফিতনা; আবু বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের নিরলস প্রচেষ্টায় যার সমাপ্তি ঘটেছিল।

(১৪৫) ধর্ম-ত্যাগীদের পরিবর্তে আল্লাহ এমন এক কওমকে নির্বাচিত করবেন, যাদের চারটি স্পষ্ট গুণ বর্ণনা করা হয়েছে; (ক) আল্লাহর প্রতি ভালবাসা রাখা ও তাঁর ভালবাসার পাত্রতে পরিণত হওয়া। (খ) ঈমানদারদের প্রতি কোমল ও বিনম্র এবং কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হওয়া। (গ) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এবং (ঘ) আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া না করা। সাহাবায়ে কেরামগণ ﷺ এই সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন। যার কারণে আল্লাহ তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে মহা সৌভাগ্যবান বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর দুনিয়াতেই তিনি তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন।

(১৪৬) এটা ঐ ঈমানদারগণের ৪র্থ নম্বর গুণ। অর্থাৎ, মহান আল্লাহর আনুগত্য ও হুকুম পালনের ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় ও পরোয়া করবে না। এ গুণটিও বড় গুরুত্বপূর্ণ গুণ। সমাজে যখন কোন পাপের প্রচলন ব্যাপক হয়ে যায়, তখন তার বিরুদ্ধে এই গুণ ছাড়া নেকীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করা সম্ভব নয়। সমাজে কত শত এমন মানুষ আছে যাঁরা পাপাচরণ, আল্লাহ-দ্রোহিতা এবং সামাজিক অশ্লীলতা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে, কিন্তু এই নিন্দুকের নিন্দা ও তিরস্কারের মোকাবেলা করার মত ক্ষমতা তাদের নেই। ফলে পাপের ঐ দলদল হতে বের হতে পারে না এবং হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার মত তওফীকও লাভ করে না। এই জন্যেই পরবর্তীতে আল্লাহ বলেছেন, যাদের মধ্যে এই চারটি গুণ বিদ্যমান আছে তাদের উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

(১৪৭) যখন ইয়াহুদ ও নাসারদের সাথে বন্ধুত্ব নিষেধ করা হয়েছে, তখন কাদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে, ঈমানদারগণের বন্ধু সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর রসূল, অতঃপর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের একান্ত অনুগত। পরবর্তীতে তাদের আরো গুণাবলী উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১৪৮) এখানে আল্লাহর দলের নিদর্শন ও তাদের বিজয়ী হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। আল্লাহর দল তাঁরাই যাঁরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের সাথে সম্পর্ক রাখে, আর ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, কাফের ও মুশরিকদের সাথে ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে না; যদিও তারা তাঁদের নিকটাত্মীয় হয়। যেমনটি সূরা মুজাদালার শেষে বলা হয়েছে যে, "যারা আল্লাহ ও পরকালের উপর

هُمْ الْغَالِبُونَ (٥٦)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٥٧)

(৫৭) হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে ও অবিশ্বাসীদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।[১৪৯] যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহকে ভয় কর।

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (٥٨)

(৫৮) আর তোমরা যখন নামাযের জন্য আহবান কর, তখন তারা ওকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে।[১৫০] কেননা তারা এক নির্বোধ জাতি।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (٥٩)

(৫৯) বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! এ ছাড়া অন্য কারণে তোমরা আমাদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নও যে, আমরা আল্লাহতে ও আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করি। আর এ জন্যও যে, তোমাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।'

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (٦٠)

(৬০) বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এ অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব, যা আল্লাহর নিকট আছে? যাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকর বানিয়েছেন এবং যারা তাগূত (গায়রুল্লাহ)র উপাসনা করে, মর্যাদায় তারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত।'[১৫১]

বিশ্বাস রাখে, তাদেরকে তুমি এরূপ পাবে না যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে; যদিও তারা তাদের পিতা, ভাই ও আত্মীয়-স্বজনও হয়।" তারপর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, এরা তো ওরাই, যাদের অন্তরে ঈমান বিদ্যমান এবং যাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করেছেন এবং এদেরকেই আল্লাহ জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন --- আর এরাই হচ্ছে আল্লাহর দল। আর তারাই হবে সফলকাম। (দ্রষ্টব্য ঃ সূরা মুজাদালার শেষ আয়াত)

(১৪৯) আহলে কিতাব বা 'পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে' বলতে ইয়াহুদ, খ্রিষ্টান এবং অবিশ্বাসী বা কাফের বলতে মুশরিক উদ্দিষ্ট। এখানেও তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করার জন্য তাকীদ করা হয়েছে। যারা ইসলাম ধর্মকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করেছে। যেহেতু তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শত্রু, সেহেতু তাদের সাথে মু'মিনদের বন্ধুত্ব হতে পারে না।

(১৫০) হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, শয়তান আযানের শব্দ শোনামাত্রই পাদতে পাদতে পলায়ন করে। তারপর আযান শেষ হওয়ার পর পুনরায় আসে এবং তাকবীর শুনে আবার পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। আর তাকবীর শেষে পুনরায় এসে যায় এবং নামাযীদের অন্তরে কুমন্ত্রণা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। (বুখারী ঃ আযান অধ্যায় ও মুসলিম ঃ নামায অধ্যায়) অনুরূপভাবে শয়তানের অনুসারীদেরকেও আযানের শব্দাবলী শুনতে ভালো লাগে না। যার জন্য তারা এ ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এই আয়াত হতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, রসূল ﷺ-এর হাদীসও দ্বীনের মূল উৎস এবং অকাট্যপ্রমাণ স্বরূপ। কেননা কুরআনে নামাযের জন্য আযানের কথা উল্লেখ হয়েছে কিন্তু এই আযান কেমন করে দেওয়া হবে? তার শব্দাবলী কি হবে? এটা কুরআনে কোথাও উল্লেখ হয়নি বরং এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যা তার দ্বীনের মূল উৎস হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ। হাদীস দ্বীনের অকাট্য প্রমাণ, মূল উৎস ও শরয়ী বিধান হওয়ার ভাবার্থ হচ্ছে, যেরূপে কুরআনের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত বিধান ও ফরযসমূহ পালন করা জরুরী ও অপরিহার্য এবং তা পরিত্যাগ করা কুফরী, অনুরূপ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিধান ও ফরযসমূহ পালন করা জরুরী ও অপরিহার্য এবং তা পরিত্যাগ করা কুফরী। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, হাদীসকে সহীহ সনদে, নবী ﷺ থেকে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়া জরুরী। আর সহীহ হাদীস চাহে তা খবরে ওয়াহেদ (একটি মাত্র বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত) হোক অথবা মুতাওয়াতির (বহু বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত) হোক, নবী ﷺ-এর কথা হোক অথবা কর্ম অথবা মৌনসম্মতি হোক, সকল শ্রেণীর হাদীসের উপর আমল করা অপরিহার্য। হাদীসকে 'খবরে ওয়াহেদ' আখ্যা দিয়ে কিংবা কুরআনের উপর অতিরিক্ত মনে ক'রে কিংবা উলামাদের ইজতিহাদ ও কিয়াসকে প্রাধান্য দিয়ে কিংবা বর্ণনাকারী ফকীহ নয় দাবী ক'রে কিংবা হাদীসের বক্তব্য জ্ঞান ও বিবেকের প্রতিকূল মনে ক'রে কিংবা আরো অন্য রকম কিছু মনে ক'রে আমল না করা ও প্রত্যাখ্যান করা অবশ্যই ঠিক নয়; বরং এ সব হাদীস অমান্য করার বিভিন্ন ধরণ বা পদ্ধতি।

(১৫১) অর্থাৎ, হে আহলে কিতাব! তোমরা আমাদের প্রতি যে বৈরীভাব পোষণ করছো তার কারণ তো এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আমরা আল্লাহর উপর, কুরআনের উপর এবং কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ সমুদয় কিতাবের উপর ঈমান এনেছি। এটাও কি কোন দোষের কথা? অর্থাৎ, এটা কোন দোষ ও নিন্দার কারণ হতে পারে না; যেমনটি তোমাদের মনে হয়েছে। এখানে استثناء منقطع হয়েছে। অবশ্য আমরা তোমাদেরকে বলে দিই, (আল্লাহর নিকট) অধিক নিকৃষ্ট ও পথভ্রষ্ট এবং ঘৃণার পাত্র ও তিরস্কারযোগ্য লোক কারা? এরা তারাই, যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের উপর তিনি রাগান্বিত হয়েছেন,

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (٦١)

(৬১) তারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি', কিন্তু তারা অবিশ্বাসসহ আসে এবং তা নিয়েই বার হয়ে যায়। আর তারা যা গোপন করে, আল্লাহ তা খুব ভালোভাবে অবহিত।[১৫২]

وَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٢)

(৬২) আর তাদের অনেককেই তুমি পাপে, সীমালংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর দেখবে। তারা যা করে, নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট!

لَوْلا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (٦٣)

(৬৩) রাব্বানী (আল্লাহ-ভক্ত)গণ ও পন্ডিতগণ কেন তাদেরকে পাপ-কথা বলতে ও অবৈধ ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? এরা যা করে নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট![১৫৩]

وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا

(৬৪) ইয়াহুদীগণ বলে, 'আল্লাহর হাত সংকুচিত।'[১৫৪] তাদের হাত সংকুচিত হোক এবং তারা যা বলে, তার জন্য তারা অভিশপ্ত হোক। বরং আল্লাহর উভয় হস্তই মুক্ত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান ক'রে থাকেন। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। তাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করেছি। যতবার তারা যুদ্ধের অগ্নি

আর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে বানর ও শূকরে পরিণত করেছেন এবং যারা তাগূত (গায়রুল্লাহ)এর পূজা করেছে। সুতরাং এই আয়নায় তোমরা নিজেদের চেহারা দেখে নাও। আর বল যে, যাদের ইতিহাস এই, তারা কারা? তারা কি তোমরাই নও?

([১৫২]) এখানে মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা নবী ﷺ-এর নিকট কুফরী অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং কুফরী অবস্থাতেই প্রস্থান করে, আর নবী ﷺ-এর সাহচর্য, তাঁর নসীহত ও উপদেশ কোন কিছুই তাদের উপর প্রভাবশীল হয় না। কেননা তাদের হৃদয় কুফরীর কলুষতায় পরিপূর্ণ। আর নবী ﷺ-এর নিকট তাদের উপস্থিতির উদ্দেশ্য হিদায়াত ও উপদেশ গ্রহণ নয়; বরং প্রবঞ্চনা ও প্রতারণাই তাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং এরূপ উপস্থিতিতে উপকার কিভাবে সম্ভব?

([১৫৩]) এখানে উলামা, মাশায়েখ, আবেদ ও ধর্মভীরু ব্যক্তিদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষদের বেশীর ভাগ লোক তোমাদের সামনে পাপাচার, অপকর্ম এবং হারামখোরীতে লিপ্ত; কিন্তু তোমরা তাদেরকে নিষেধ কর না। এই অবস্থায় তোমাদের নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা খুব বড় অপরাধ। এর দ্বারা পরিষ্কার হয় যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান করার কত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা পরিত্যাগ করা কত ভয়ানক ও কঠিন শাস্তিযোগ্য। যেমন বহু হাদীসেও এ বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

([১৫৪]) এখানে ঐ কথারই পুনারাবৃত্তি করা হয়েছে, যা সূরা আলে ইমরানের ১৮১নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যখন নিজের রাস্তায় খরচ করার জন্য উৎসাহিত করলেন এবং এটাকে তিনি 'উত্তম ঋণদান' বলে অভিহিত করলেন, তখন ইয়াহুদীরা বলল, 'আল্লাহ তো ফকীর! লোকদের নিকট ঋণ চাচ্ছে।' প্রকৃতপক্ষে তারা মহান আল্লাহর বাচন-ভঙ্গির নিগূঢ় সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারল না। অর্থাৎ, সমস্ত কিছুই আল্লাহর দান এবং আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে কিছু অংশ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা কোন ঋণ নয়। কিন্তু তাঁর এটা পরিপূর্ণ অনুগ্রহ যে, তিনি এর বিনিময়ে খুব বেশী প্রতিদান দিয়ে থাকেন। যেমন একটি দানার পরিবর্তে সাত সাতশো দানা পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেন। আর এটাকেই 'উত্তম ঋণ' বলে ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে যে, যত বেশী তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে, তার থেকে অনেক বেশী তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। مغلولة শব্দের অর্থ بخيلة কৃপণ। অর্থাৎ, ইয়াহুদীদের আসল উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, আল্লাহর হাত প্রকৃতপক্ষে বাঁধা; বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর হাত খরচ করা হতে বিরত আছে। (ইবনে কাসীর) আল্লাহ বলেন, আসলে তাদেরই হাত বাঁধা আছে। অর্থাৎ, কৃপণতা তাদেরই অভ্যাস। আর আল্লাহর দুই হাতই বন্ধনমুক্ত; তিনি যেভাবে ইচ্ছা খরচ করেন। তিনি বিশাল অনুগ্রহশীল, মহাদাতা। সমস্ত ধন-ভাণ্ডার তাঁরই হাতে রয়েছে এবং তিনি সকল সৃষ্টজীবের সমস্ত রকমের অভাব ও প্রয়োজন পূরণ ক'রে থাকেন। আমাদের রাতে-দিনে, ঘরে-সফরে এবং অন্যান্য সকল অবস্থায় সমস্ত রকমের অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করেন। আল্লাহ বলেন, {وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে প্রত্যেকটি সেই জিনিস দিয়েছেন, যা তোমরা তাঁর নিকট চেয়েছ। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না; মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় সীমালংঘনকারী অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইব্রাহীম ৩৪) হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহর দক্ষিণহস্ত পরিপূর্ণ, তিনি দিবারাত্র খরচ করেন, তাঁর ভাণ্ডার কোন রকম হ্রাস পায় না। লক্ষ্য কর, যখন থেকে তিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে অদ্যাবধি খরচ ক'রে আসছেন। কিন্তু তাঁর ধনভান্ডারে কোন ঘাটতি হয়নি।" (বুখারী ও মুসলিম)

أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً وَاللهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٦٤)

প্রজ্বলিত করে, ততবার আল্লাহ তা নির্বাপিত করেন[১৫৫] এবং তারা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ ক'রে বেড়ায়।[১৫৬] বস্তুতঃ আল্লাহ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্তদেরকে ভালবাসেন না।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٦٥)

(৬৫) ঐশীগ্রন্থধারিগণ যদি বিশ্বাস করত ও সংযমী হত,[১৫৭] তাহলে আমি তাদের দোষ অপনোদন করতাম এবং তাদেরকে সুখদায়ক উদ্যানে প্রবেশাধিকার দান করতাম।

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (٦٦)

(৬৬) আর যদি তারা তওরাত, ইঞ্জীল ও যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকত,[১৫৮] তাহলে তারা তাদের উপর দিক (আকাশ) ও পায়ের নিচের দিক (পৃথিবী) হতে খাদ্য লাভ করত।[১৫৯] তাদের মধ্যে এক দল রয়েছে যারা মধ্যপন্থী, কিন্তু তাদের অধিকাংশ যা করে, তা নিকৃষ্ট![১৬০]

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ

(৬৭) হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি তা না কর, তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।[১৬১] আল্লাহ তোমাকে মানুষ হতে

([১৫৫]) অর্থাৎ, যখন তারা তোমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে অথবা যুদ্ধ করার জন্য কোন উপায় অনুসন্ধান করে, তখনই আল্লাহ তাদের সেই চক্রান্ত নস্যাৎ ক'রে দেন এবং তাদের সেই চক্রান্ত তাদের উপরেই পতিত করেন। ফলে তারা পরের জন্য কুয়া খুঁড়ে, কিন্তু নিজেরাই তাতে ডুবে মরে!

([১৫৬]) তাদের দ্বিতীয় অভ্যাস হচ্ছে যে, তারা সব সময় পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার মত নীচ ও মন্দ প্রচেষ্টায় অব্যাহত থাকে, অথচ আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

([১৫৭]) অর্থাৎ আল্লাহর নিকট যে ঈমান বাঞ্ছনীয়, তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল, মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করা। যেমনটি ইতিপূর্বে সমস্ত নাযিলকৃত গ্রন্থে এই একই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ-ভীতি অবলম্বন করা ও তাঁর অবাধ্যাচরণ থেকে দূরে থাকার মধ্যে সব থেকে বড় কুকর্ম হল সেই শির্ক, যাতে তারা পুরোপুরি ডুবে আছে এবং সেই অস্বীকার, যা শেষ রসূলের সাথে তারা অবলম্বন করেছে।

([১৫৮]) তাওরাত ও ইঞ্জীলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার বিধানের অনুসরণ করা, যা তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। আর সেই বিধানের মধ্যে একটা এও ছিল যে, শেষ নবীর প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করবে। وما أنزل এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, সমস্ত আসমানী গ্রন্থের উপর ঈমান আনয়ন করা; আর এর মধ্যে কুরআন কারীমও শামিল। সুতরাং আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা যেন ইসলাম গ্রহণ করে।

([১৫৯]) 'উপর-নীচের' কথা অতিশয়োক্তি রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, বেশী বেশী এবং বিভিন্ন ধরনের রুযী আল্লাহ তাদেরকে দান করতেন। অথবা 'উপর' বলতে আসমানকে বুঝানো হয়েছে, আর তার অর্থ হচ্ছে, সময় মত আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। আর 'পায়ের নিচে' বলতে যমীনকে বুঝানো হয়েছে, আর তার অর্থ হচ্ছে; যমীন এই পানি নিজের মধ্যে শোষণ ক'রে বিভিন্ন ধরনের ফসলাদি উৎপাদন করত। পরিণামে তাদের জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ} অর্থাৎ, জনপদবাসীরা যদি ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের উপর আসমান ও যমীনের বরকত নাযিল করতাম। (সূরা আ'রাফ ৯৬ আয়াত)

([১৬০]) কিন্তু তাদের বেশীর ভাগ মানুষ ঈমানের রাস্তা অবলম্বন করল না এবং তারা কুফরীর উপরেই অটল থাকল, আর রিসালাতে মুহাম্মাদীকে অস্বীকার করার ব্যাপারে অবিচল থাকল। এই অটল থাকা ও অস্বীকার করাকে 'নিকৃষ্ট কর্ম' বলে আখ্যায়ন করা হয়েছে। মধ্যপন্থী দল থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে, আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﷺএর মত ৮-৯ জন সাহাবা, যাঁরা মদীনার ইয়াহুদীদের মধ্য হতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

([১৬১]) এই আদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে কম-বেশী (সংযোজন-বিয়োজন) না ক'রে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া না ক'রে, তুমি মানুষের নিকট পৌঁছে দাও। সুতরাং তিনি এমনটিই করেছিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করে যে, নবী ﷺ কিছু জিনিস গোপন রেখেছেন, (প্রকাশ বা প্রচার করেননি), সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। (বুখারী ৪৮৫৫নং) একদা আলী ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল যে, আপনাদের নিকট কুরআন ব্যতীত অহীর মাধ্যমে অবতীর্ণকৃত কোন জিনিস আছে কি? উত্তরে তিনি কসম করে বললেন, না। তবে কুরআন উপলব্ধি করার জ্ঞান, আল্লাহ যাকে দান করেন। (বুখারী) বিদায় হজ্জের সময় এক লক্ষ অথবা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সাহাবার সামনে মহানবী ﷺ বলেছিলেন, "তোমরা আমার ব্যাপারে কি বলবে?" তাঁরা সকলেই বলেছিলেন যে,'আমরা সাক্ষ্য দেব যে, (আপনার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা) পৌঁছে দিয়েছেন, (আমানত) আদায় করে দিয়েছেন এবং (উম্মতের জন্য) হিতাকাঙ্ক্ষা ও নসীহত করেছেন।' মহানবী ﷺ আসমানের দিকে আঙ্গুল তুলে ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে

রক্ষা করবেন।[১৬২] বস্তুতঃ আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٦٧)

(৬৮) বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! তওরাত, ইঞ্জীল ও যা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তি নেই।' তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে।[১৬৩] সুতরাং তুমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٦٨)

(৬৯) নিশ্চয় যারা বিশ্বাসী, ইয়াহুদী, স্বাবেয়ী ও খ্রিষ্টান; তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করবে এবং সৎকাজ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[১৬৪]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٩)

(৭০) বনী ইস্রাঈলের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম ও তাদের নিকট বহু রসূল প্রেরণ করেছিলাম। যখনই কোন রসূল তাদের নিকট এমন কিছু নিয়ে আগমন করে, যা তাদের মনঃপূত নয়, তখনই তারা (তাদের) কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে।

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ (٧٠)

(৭১) আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের কোন শাস্তি হবে না ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল।[১৬৫] অতঃপর আল্লাহ

وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللهُ

দিয়েছি?" অথবা তিনি তিনবার বললেন, "আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।" (মুসলিম) অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি। তুমি সাক্ষী থাকো, তুমি সাক্ষী থাকো, তুমি সাক্ষী থাকো। *(এখান থেকে তাদের কথাও মিথ্যা প্রমাণিত হয়, যারা বলে কুরআন ৪০, ৬০ অথবা ৯০ পারা; সেগুলো কারো কলবে গুপ্ত আছে। অথবা শরীয়তের ইল্‌ম ছাড়া গুপ্ত ইল্‌ম বলে কিছু আছে। -সম্পাদক)*

(১৬২) এই নিরাপত্তা বিধান ও রক্ষণাবেক্ষণ আল্লাহ তাআলা অলৌকিক পদ্ধতি দ্বারা ও পার্থিব কিছু উপায়-উপকরণ দ্বারাও করেছেন। পার্থিব বাহ্যিক উপকরণের মধ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার বহু পূর্বে আল্লাহ তাআলা রসূল ﷺ-এর চাচা আবু তালেবের অন্তরে প্রকৃতি ও স্বভাবগত ভালোবাসা দান করেন এবং তিনি তাঁর নিরাপত্তা বিধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকেন। তাঁর কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাটাও সম্ভবতঃ উক্ত উপকরণের একটি অংশ। কেননা, তিনি যদি মুসলমান হয়ে যেতেন, তাহলে সম্ভবতঃ কুরাইশদের নেতৃবর্গের অন্তরে তাঁর প্রতি সেই সমীহ ও সম্মান অবশিষ্ট থাকত না, যা তাঁর স্বধর্মাবলম্বী থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত ছিল। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলা কিছু কুরাইশদের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে মদীনার আনসারগণের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করেন। তারপর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি বাহ্যিক সুরক্ষা ব্যবস্থা (দেহরক্ষী বা পাহারাদার ইত্যাদি) উঠিয়ে দেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে রক্ষা করেন ও নিরাপত্তা দেন। সুতরাং অহী দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইয়াহুদীদের বিভিন্ন কুচক্রান্তের কথা যথাসময়ে অবহিত করেন। এমনিভাবে কঠিন বিপদ ও তুমুল যুদ্ধের সময় কাফেরদের ভয়ঙ্কর আক্রমণ হতে রক্ষা করেন। এ হল আল্লাহর কুদরত। তিনি যা ইচ্ছা তকদীর নির্ধারিত করেন। তাঁর তকদীর ও ফায়সালা রদ্দ করার মত ক্ষমতা কারো নেই। তাঁর বিরুদ্ধে বিজয়ী কেউ নেই। তিনিই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ।

(১৬৩) এই হিদায়াত ও ভ্রষ্টতা সেই নিয়ম মোতাবেক হয়ে থাকে যা আল্লাহর ব্যাপক নিয়ম। অর্থাৎ, যেমন কিছু জিনিস ও কর্মের ফলে ঈমানদারদের ঈমান, সত্যায়ন, নেক আমল ও উপকারী ইল্‌ম বৃদ্ধি পায়, অনুরূপ পাপ এবং তার উপর অটল থাকার ফলে কুফরী ও অবাধ্যতা বৃদ্ধি পায়। আর এই বিষয়টিকেই মহান আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন, যেমন {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ} অর্থাৎ, (হে নবী) বল, বিশ্বাসীদের জন্য এ পথনির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধকারস্বরূপ। এরা এমন যে, যেন এদেরকে বহু দূর হতে আহবান করা হয়। (সূরা হা-মীম সাজদাহ ৪৪) তিনি অন্যত্র বলেন, {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا} অর্থাৎ, আমি কুরআন অবতীর্ণ করি, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও দয়া; কিন্তু তা যালেমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা বানী ইসরাঈল ৮২)

(১৬৪) এটা ঐ বিষয়ই যা সূরা বাক্বারার ৬২নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে দেখুন।

(১৬৫) অর্থাৎ, তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের কর্মে কোন শাস্তি সন্নিবিষ্ট নেই। কিন্তু উল্লিখিত আল্লাহর নিয়ম মোতাবেক এই শাস্তি সন্নিবিষ্ট ছিল যে, তারা সত্য দর্শনের ব্যাপারে অধিক অন্ধ এবং সত্য শ্রবণ করার ব্যাপারে অধিক বধির হয়ে গেল। আর

عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٧١)

তাদের তওবা কবুল করেছিলেন। পুনরায় তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হয়েছিল। আর তারা যা করে, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (٧٢)

(৭২) তারা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাসী (কাফের), যারা বলে, 'আল্লাহই মারয়্যাম-তনয় মসীহ।'[১৬৬]অথচ মসীহ বলেছিল, 'হে বনী ইস্রাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপাসনা কর।[১৬৭] অবশ্যই যে কেউ আল্লাহর অংশী করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্ত নিষিদ্ধ করবেন ও দোযখ তার বাসস্থান হবে এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।'[১৬৮]

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِـدٌ وَإِنْ لَمْ يَنتَهُـوا عَـمَّا يَقُولُـونَ لَيَمَسَّـنَّ الَّـذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٣)

(৭৩) তারা নিশ্চয় অবিশ্বাসী (কাফের), যারা বলে, 'আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন।'[১৬৯] অথচ এক উপাস্য ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নেই। তারা যা বলে তা হতে নিবৃত্ত না হলে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের উপর অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবে।

أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٧٤)

(৭৪) তবে কি তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? বস্তুতঃ আল্লাহ মহাক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

তওবা করার পর পুনরায় সেই কর্মেই লিপ্ত হল, তাই তাদের শাস্তিও দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্ত হল।

(১৬৬) একই বিষয় ১৭নং আয়াতেও আলোচিত হয়েছে। এখানে আহলে কিতাবদের ভ্রষ্টতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এ আয়াতে তাদের ঐ ফির্কার কুফরীর কথা প্রকাশ পেয়েছে, যারা মাসীহ (ঈসা ﷺ)কে স্বয়ং আল্লাহ বলে।

(১৬৭) ঈসা ﷺ দুগ্ধপোষ্য শিশু অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশে (যে বয়সে সাধারণতঃ শিশুরা কথা বলতে পারে না) সর্বপ্রথম নিজের মুখ থেকে নিজের দাসত্বের কথা প্রকাশ করে বলেছিলেন, {إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا} অর্থাৎ 'আমি আল্লাহর বান্দা বা দাস, তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন।' (সূরা মারয়্যাম ৩০) মাসীহ ﷺ এটা বলেননি যে, আমিই আল্লাহ অথবা আল্লাহর পুত্র। বরং শুধুমাত্র তিনি বলেছিলেন, 'আমি আল্লাহর বান্দা বা দাস' এবং তিনি পরিণত বয়সে উপনীত হয়ে (মানুষকে) এই দাওয়াতই দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, {إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ} অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভু, সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর --এটাই সরল পথ। (সূরা আলে ইমরান ৫১) এই সেই শব্দাবলী যা তিনি মায়ের কোলেও বলেছিলেন। (দ্রষ্টব্য; সূরা মারয়্যামের ৩৬নং আয়াত) অনুরূপ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি আসমান হতে অবতরণ করবেন, যার সংবাদ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর (অবতরণের) ব্যাপারে আহলে সুন্নাহ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদর্শের অনুগামী হয়ে মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহবান জানাবেন; নিজের ইবাদতের প্রতি নয়।

(১৬৮) মাসীহ ﷺ আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছায় নিজ মুখে দাসত্বের ও রিসালতের কথা প্রকাশ ঐ সময় করেছিলেন যখন তিনি মায়ের কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন। অনুরূপ যখন তিনি পরিণত বয়সে উপনীত হলেন তখনও এই কথাই ঘোষণা ক'রে (বলেছিলেন যে, আমি আল্লাহর বান্দা বা দাস ও তাঁর রসূল।) সেই সঙ্গে তিনি শির্কের ভয়াবহতা ও পরিণাম সম্পর্কে অবহিত ক'রে বলেছিলেন যে, মুশরিকদের জন্য জান্নাত চিরতরে হারাম, আর তার কেউ সাহায্যকারীও হবে না যে, তাকে সে জাহান্নাম থেকে বের ক'রে আনবে; যেরূপ মুশরিকরা মনে করে।

(১৬৯) এ হল খ্রিষ্টানদের দ্বিতীয় ফির্কা, যারা তিন ঈশ্বরের দাবীদার ছিল। যেটাকে তারা (One God in Three Person) বলে। আর এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে যদিও খোদ তাদের মধ্যেই মতবিরোধ বিদ্যমান, তবুও সঠিক কথা এই যে, তারা ঈসা ﷺ ও তাঁর মা মারয়্যাম (আঃ)কেও আল্লাহর সাথে (সমকক্ষ ভেবে) মাবূদ বা উপাস্যরূপে গণ্য করতো; যেরূপ কুরআন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন ঈসা ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করবেন, {أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّه} অর্থাৎ, তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার আম্মাকে মা'বূদ (উপাস্য) বানিয়ে নাও? (সূরা মাইদাহ ১১৬) এখান থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, খ্রিষ্টানরা ঈসা ﷺ ও তাঁর মাতা মারয়্যাম (আঃ)কে উপাস্য হিসাবে গণ্য করে। আর আল্লাহ তৃতীয় উপাস্য বা মা'বুদ। যাকে তারা 'তিনের তৃতীয়' বলে আখ্যায়ন করে। তাদের প্রথম বিশ্বাসের মতই আল্লাহ এ বিশ্বাসকেও কুফরী বলে মন্তব্য করেছেন।

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٧٥)

(৭৫) মারয়্যাম-তনয় মসীহ তো একজন রসূল মাত্র। তার পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছে এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল।[১৭০] তারা উভয়ে খাদ্যাহার করত।[১৭১] দেখ, ওদের জন্য আয়াত (বাক্য) কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি। আরও দেখ, ওরা কিভাবে সত্য-বিমুখ হয়।

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٧٦)

(৭৬) বল, 'তোমরা কি আল্লাহ ভিন্ন এমন কিছুর উপাসনা কর, যার তোমাদের ক্ষতি ও উপকার করার কোন ক্ষমতা নেই? বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।'[১৭২]

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (٧٧)

(৭৭) বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না[১৭৩] এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে[১৭৪] এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।'

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ(٧٨)

(৭৮) বনী ইস্রাঈলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা দাউদ ও মারয়্যাম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল।[১৭৫] কেননা, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী।[১৭৬]

كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا

(৭৯) তারা যেসব গর্হিত কাজ করত, তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না।[১৭৭] তারা যা করত, নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট।

(১৭০) صديقة শব্দের অর্থ; মু'মিন ও অলী। অর্থাৎ, তিনিও ঈসা ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়নকারী এবং তাঁকে সত্যজ্ঞানকারীদের একজন ছিলেন। আর তার অর্থ এই যে, তিনি নবী ছিলেন না। যেমনটি কিছু লোকের ধারণা, যাঁরা মারয়্যাম (আঃ) সহ (ইসহাক ﷺ-এর জননী) সারাহ এবং মূসা ﷺ-এর জননীকে নবী ছিলেন বলে মনে করেন। আর এর প্রমাণে তাঁরা বলেন যে, প্রথমোক্ত দুই জনের সাথে ফিরিশ্তাগণের কথোপকথন হয়। আর মূসা ﷺ-এর জননীর সাথে স্বয়ং আল্লাহ অহী করেন। আর এই কথোপকথন ও অহী উভয়ই নবী হওয়ারই প্রমাণ। কিন্তু অধিকাংশ উলামাগণের নিকট এ প্রমাণ বা দলীল এমন নয়, যা কুরআনের স্পষ্ট উক্তির মোকাবেলা করতে পারে। মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, "আমি যত রসূল পাঠিয়েছি সকলেই পুরুষ ছিল। (সূরা ইউসুফ ১০৯)

(১৭১) ঈসা ﷺ এবং মারয়্যাম (আঃ) আল্লাহ বা উপাস্য ছিলেন না; বরং তাঁরা উভয়ে মানুষ ছিলেন তার প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। যেহেতু পানাহার করা মানুষের দৈহিক চাহিদা ও প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে গণ্য। যিনি মা'বুদ বা উপাস্য তিনি এ সবের ঊর্ধ্বে; বরং ঊর্ধ্ব থেকেও ঊর্ধ্বে।

(১৭২) এটাই মুশরিকদের নির্বোধ হওয়ার পরিচয় যে, তারা তাদেরই মধ্য হতে একজনকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, যে কারো কোন উপকার বা অপকার সাধন করতে পারে না। আর কারো উপকার বা অপকার সাধন করা তো দূরের কথা, সে না কারো কথা শুনতে পায়, আর না কারো অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। বরং এই শক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর মধ্যেই আছে। আর এই জন্যই তিনি হচ্ছেন একমাত্র বিপত্তারণ ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী।

(১৭৩) অর্থাৎ, সত্যের অনুসরণ করতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করো না। যাঁর সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করে তাঁকে আল্লাহর আসনে অধিষ্ঠিত করো না। যেমন ঈসা ﷺ-এর ব্যাপারে তোমরা করেছ। অতিরঞ্জন সর্বযুগে শির্ক ও ভ্রষ্টতার সব থেকে বড় উপকরণ হিসাবে দেখা গেছে। মানুষের মনে যাঁর প্রতি নিতান্ত বিশ্বাস ও ভালোবাসা আছে, সে তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করে থাকে। তিনি যদি ইমাম বা ধর্মীয় নেতা হন, তাহলে তাঁকে নবীদের মত নিষ্পাপ মনে করা এবং নবীদেরকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা তো সাধারণ ব্যাপার। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিমরাও এই অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত নয়। তারাও কিছু ইমাম ও উলামার ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করেছে যে, তাঁদের রায় ও উক্তি এমনকি তাঁদের প্রতি সম্পৃক্ত ফতোয়া এবং ফিক্হকেও রসূল ﷺ-এর হাদীসের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছে!

(১৭৪) অর্থাৎ, পূর্ববর্তী লোকেদের পিছে পড়ো না, যারা এক নবীকে মা'বূদ বা উপাস্য বানিয়ে নিয়ে নিজেরা ভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরকেও ভ্রষ্ট করেছে।

(১৭৫) অর্থাৎ, যবুরের মধ্যে যা দাউদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং ইঞ্জীলের মধ্যে যা ঈসা ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এই অভিশাপ কুরআনের মাধ্যমেও তাদেরকে করা হচ্ছে, যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। 'লানত বা অভিশাপ' এর অর্থ হচ্ছে; আল্লাহর রহমত ও তার করুণা থেকে বঞ্চনা।

(১৭৬) এ হল অভিশাপের হেতু। (ক) অবাধ্যতা; অর্থাৎ, ওয়াজেব কর্ম ত্যাগ ক'রে এবং হারাম কর্ম সম্পাদন ক'রে তারা আল্লাহর অবাধ্যতা করেছিল। (খ) সীমালংঘন; অর্থাৎ, অতিরঞ্জন ও বিদআত রচনা ক'রে তারা সীমালংঘন করেছিল।

(১৭৭) এর উপর (অভিশাপের) অতিরিক্ত কারণ হল, তারা একে অপরকে মন্দ কর্ম হতে বাধা প্রদান করত না, যা স্বস্থানে একটা বড় অপরাধ। কোন কোন ভাষ্যকার (মন্দ কর্মে) বাধা প্রদান না করাকেই অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন হিসাবে গণ্য করেছেন, যা

يَفْعَلُونَ (٧٩)

تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (٨٠)

(৮০) তাদের অনেককে তুমি অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। তাদের কৃতকর্ম কত নিকৃষ্ট, যে কারণে আল্লাহ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন! আর তারা চিরকাল শাস্তিভোগ করবে।[১৭৮]

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٨١)

(৮১) তারা আল্লাহতে, (মুহাম্মাদ) নবীতে ও তার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস করলে, ওদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের অনেকে সত্যত্যাগী।[১৭৯]

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (٨٢)

(৮২) অবশ্যই বিশ্বাসীদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহুদী ও অংশীবাদীদেরকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে[১৮০] এবং মানুষের মধ্যে যারা বলে, 'আমরা খ্রিষ্টান', তাদেরকেই তুমি সম্প্রীতির ব্যাপারে বিশ্বাসীদের নিকটতর দেখবে। কারণ, তাদের মধ্যে অনেক পন্ডিত ও সংসার-বিরাগী আছে। আর তারা অহংকারও করে না।[১৮১]

তাদের অভিশপ্ত হওয়ার কারণ। যাই হোক, উভয় অবস্থাতেই মন্দ কাজ দেখে সেই মন্দ থেকে বাধা প্রদান না করা মহা অপরাধ এবং আল্লাহর গযব বা ক্রোধ ও অভিশাপের কারণ। ('অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।') আর হাদীসেও এ ধরনের অপরাধের বড় কঠিন শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, "সর্বপ্রথম বানী ইস্রাঈলের মধ্যে যে ত্রুটি প্রবেশ করেছিল তা হচ্ছে, একজন মানুষ যখন অপরকে কোন অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত দেখত, তখন বলত, আল্লাহকে ভয় কর। আর এই পাপ বর্জন কর। এ তোমার জন্য বৈধ নয়। কিন্তু তারপর দিনই তার সাথে পানাহার ও উঠা-বসা করতে কোন প্রকার ঘৃণা বা লজ্জা বোধ করত না। (অর্থাৎ তারা একই মজলিসে এক সঙ্গে বসে পানাহার করত।) অথচ ঈমানের দাবী ছিল, তাদের প্রতি ঘৃণা ও সম্পর্ক ছেদন করা। যার ফলে আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা প্রক্ষিপ্ত করেন এবং তারা আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়।" নবী ﷺ তারপর বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই লোকদেরকে নেকী বা সৎকর্মের নির্দেশ প্রদান করবে এবং মন্দ কর্ম থেকে বাধা দান করবে। আর অত্যাচারীর হাত ধরে নেবে। (তা-না হলে তোমাদের অবস্থাও অনুরূপ হবে।)---।" (আবু দাউদ ৪৩৩৬নং) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এই অপরিহার্য কর্তব্য ত্যাগ করার শাস্তি এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে তা গ্রহণ করা হবে না। (আহমাদ ৫/৩৮৮)

(১৭৮) কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার ফল এই যে, আল্লাহ তাদের উপর অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হয়েছেন। আর এই অসন্তুষ্টির পরিণাম হচ্ছে, জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি।

(১৭৯) এর ভাবার্থ এই যে, যার মধ্যে প্রকৃতার্থে ঈমান আছে, সে কস্মিনকালেও কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবে না।

(১৮০) এই জন্য যে, ইয়াহুদীদের মধ্যে একগুঁয়েমি, হঠকারিতা, হক থেকে বিমুখতা, দাম্ভিকতা ও গর্ব এবং জ্ঞানী ও ঈমানদারদের অবজ্ঞা করার প্রবণতা ব্যাপক প্রচলিত। আর এ জন্যেই নবীগণকে হত্যা ও তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। এমনকি কয়েক বার তারা মহানবী ﷺ-কে হত্যা করার কুচক্রান্ত করে। তাঁকে যাদু করে এবং বিভিন্নভাবে ক্ষতি সাধন করার মত জঘন্য অপচেষ্টাও করে। অনুরূপ কুকীর্তি মুশরিকদেরও।

(১৮১) رهبان এর ভাবার্থ; সৎ, আবেদ, সংসার-বিরাগী বা নির্জনবাসী আর قسيسين এর ভাবার্থ; পন্ডিত। অর্থাৎ, এই খ্রিষ্টানদের মধ্যে জ্ঞান ও বিনয় আছে। আর এই জন্যই ইয়াহুদীদের মত তাদের হঠকারিতা ও দাম্ভিকতা ছিল না। এছাড়া খ্রিষ্টান ধর্মে নম্রতা, উদারতা ও ক্ষমাশীলতার শিক্ষার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মান আছে। এমন কি তাদের ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে, কেউ যদি তোমার ডান গালে চড় মারে, তাহলে তার সামনে বাম গাল বাড়িয়ে দাও। অর্থাৎ ঝগড়া-বিবাদ করবে না। এই কারণে ইয়াহুদীদের তুলনায় খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের নিকটতর। খ্রিষ্টানদের এই প্রশংসা ইয়াহুদীদের মোকাবেলায় করা হয়েছে। নচেৎ ইসলাম-বিদ্বেষের অভ্যাস কম-বেশী তাদের মধ্যেও আছে। যেমন এ কথা ক্রুস ও ক্রিসেন্টের বহু শতাব্দী-ব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে স্পষ্ট এবং যা অদ্যাবধি চলে আসছে। আর বর্তমানে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সরগরম। এই কারণেই কুরআনে উভয় সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে।